১.৫০

বেশীর ভাগ মায়েদের চিন্তা,
বাচ্চাদের খাবারে যথেষ্ট পুষ্টি হ'ল কিনা।
কিন্তু সুচিত্রা নিশ্চিন্ত।

সুচিত্রা বলেন: "আমি ওদের প্রতিদিন হরলিক্স খাওয়াই, ডাক্তারবাবু বলার পর থেকেই হরলিক্স ওদের দৈনন্দিন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, আমি জানি, হরলিক্স ওদের সুস্থ-সবল রাখতে সাহায্য করে, আপনিও ছেলেমেয়েদের রোজ হরলিক্স খাওয়ান তো?"

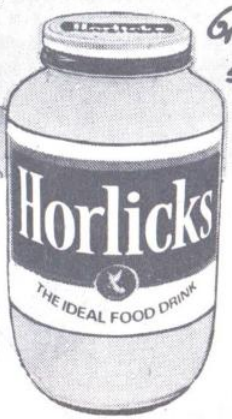

মহান শক্তিদাতা

"পুষ্টির একটি মূল উৎস হ'ল হরলিকস্। পুষ্টিকর খাদ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে তৈরী হরলিকসের উৎকৃষ্টতা বহুবন্দর ধরে বিখ্যাত। তাইতো দিনের পর দিন আপনার পরিবারকে সুস্থ, সবল আর সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস্ খেতে পরামর্শ দিই"

হরলিক্স একটা ট্রেডমার্ক।

আনন্দমেলা

১১ চৈত্র ১৩৮৭ • ২৫ মার্চ ১৯৮১ • ৬ বর্ষ • ২৫ সংখ্যা

গল্প

কালো ঘোড়া । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১০
দাদুর পার্টি । মিহির সিংহ ১৮
ভাগ্য । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭
কালীঠাকুমা । প্রদীপচন্দ্র বসু ৪৯
মানুষ-ডাকাত । অমরনাথ দে ৫২

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৩
সিসের আঙটি । বিমল কর ৪৬

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৫

ছড়া

জ্যোৎস্নারাতে । শঙ্খ ঘোষ ১৭

ভ্রমণকাহিনী

ইয়োসিমিটি । পবিত্র সরকার ৪

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি.কে. ৫৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

ভাষার খেলা । কুন্তক ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

মেলবোর্নে জয় । অলোক দাশগুপ্ত ৪২
নার্ভাস নাইনটি । অশোক রায় ৪৫

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৩৯
ছবির মজা ৫৫, মণিমেলার খবর ৫৫
আঁকো, শেখো ৬৬
কপিলদেবের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদ চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্‌স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

একটি অনুপম সূর্যাস্ত

ইয়োসিমিটি

পবিত্র সরকার

কিটি হোটন যখন স্কুলে পড়ত, তখনই সে মার্কিনদেশের জুনিয়ার আইস স্কেটিং চ্যাম্পিয়ন ছিল। তার কোচ একদিন বললেন, "এবার তুমি অলিম্পিকের কথা ভেবে তৈরি

সিকুইয়া গাছ, গুঁড়িতে আগুন লেগে এই দশা।

হও," আর তাতেই তার বাবা তার স্কেটিং করা বন্ধ করে দিলেন, বললেন, "না, আমি চাই অধ্যাপনা করবে, স্কেটিং চ্যাম্পিয়ান মেয়েতে আমার দরকার নেই।" ব্যস, কিটি নেহাত ছাত্রী হয়ে গেল। পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএচ-ডি প্রোগ্রামে ঢুকে পড়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দিল।

এমনই একটা মুহূর্তে টোরাণ্টোতে তার সঙ্গে আমাদের আলাপ। আলাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুত্ব। কিটি বলল, "সান-ফ্রানসিসকোতে যদি যাও, তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে দেওয়ার দায় আমার। চলে এসো জলদি করে।"

তা আমরা সত্যি-সত্যি একদিন সান-ফ্রানসিসকো গেলাম বেড়াতে। কিটিকে ফোন করামাত্রই সে বলল, "এক্ষুনি যাচ্ছি।" কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তার উজ্জ্বল লাল রঙের ফোকসওয়াগন 'বীট্‌ল' গাড়িটা হাঁকিয়ে সে হাজির, বললে, "কোথায় যাবে বলো।" আমরা টুরিস্টদের মামুলি লিস্টি দিতেই সে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ওসব হবে এখন। আমি তোমাদের জন্যে একটা অন্যরকম প্ল্যান করে রেখেছি। আমরা আজ যাব ইয়ো-সিমিটি।"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, "ইয়োসিমিটি! সে আবার কোথায়?"

কিটি আমাদের অজ্ঞতায় একটু আহত বোধ করল। বলল, "ইয়োসিমিটি এদেশের সবচেয়ে সুন্দর ন্যাশনাল পার্ক। এদেশে তোমরা কিছুদিন কাটালে ইয়োসিমিটি তোমাদের দেখতেই হবে, নইলে মার্কিনবাস তোমাদের বৃথা। তার উপর ইয়োসিমিটির দোরগোড়ায় এসে পড়েছ, না দেখে গেলে পরে খুব পস্তাবে। চলো, আজ আমরা ক্যাম্পিং করব সেখানে।"

ক্যাম্পিংয়ের নাম শুনেই তো আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তক্ষুনি আমাদের স্লিপিং ব্যাগ তুলে দিলাম ঐ বীট্‌লের সামনের ট্রাঙ্কে—কিটির স্ট্যানফোর্ডের বাসায় পৌঁছে সেখান থেকে তুলে নিলাম আরো দুটি স্লিপিং ব্যাগ—সে দুটি আবার 'আইডার ডাউন' বা হাঁসের পালকের—গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারের মধ্যেও তাতে ঢুকে পড়ে তুমি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারো। আর

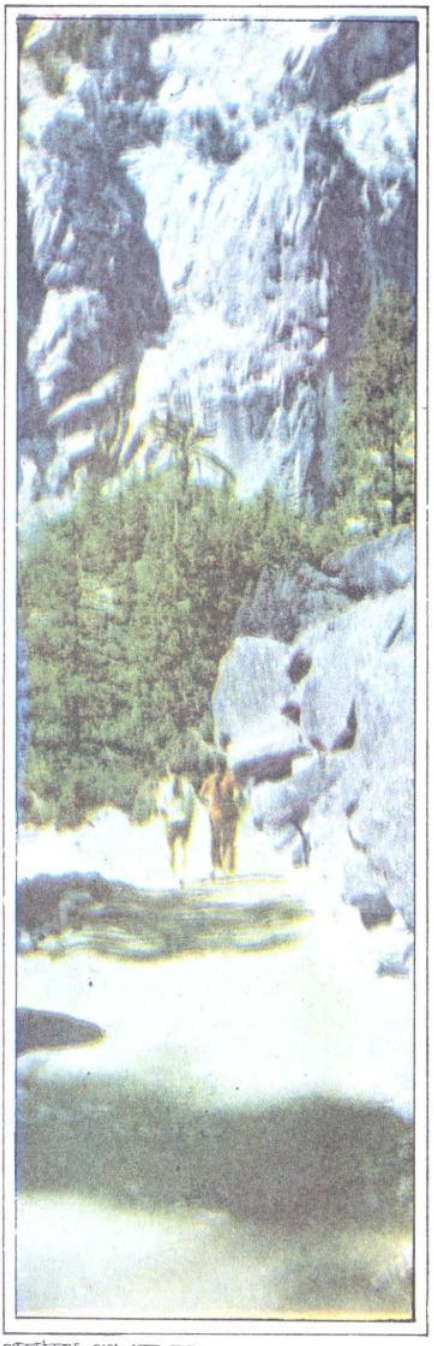

নিলাম পিঠে ঝোলানো ব্যাগে টুথব্রাশ-পেস্ট এইসব নানা টুকিটাকি, পথের একটা সুপার-মার্কেট থেকে কিনে নিলাম স্যাণ্ডউচ তৈরির রুটি। স্প্রেড, মাংসের চিলতে, লেটুস পাতা, রুটি। ব্যস, আয়োজন শেষ।

ইয়োসিমিটি, ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ' অর্থাৎ সিধে মাপলে, সানফ্রানসিসকোর দেড়শো মাইল দক্ষিণ-পুবে, কিন্তু পাহাড়ে রাস্তা, যেতে হয় ফ্রেজনো হয়ে প্রায় একশো মাইল ঘুরে, আর আমরা বেরিয়েছিও বেশ সন্ধে-সন্ধে করে, ফলে পৌঁছতেই রাত দশটা হয়ে গেল। যখন পৌঁছুলাম তখন সব শুনশান। সিয়েরা নেভাদা অর্থাৎ 'আলোক-পর্বতমালা'র পশ্চিম ঢালে অবস্থিত এই পাহাড় ও উপত্যকাময় ন্যাশনাল পার্ক তখন গভীর ঘুমে স্তব্ধ। তখন 'আর্ট রক' গেটের প্রহরীরা পর্যন্ত শুয়ে পড়েছে, ফলে দিনের বেলায় এন্ট্রেল যেখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হত সেখানে আমরা ফাঁকতালে বিনে পয়সায় ঢুকে পড়লাম। তখন একটা ক্যাম্পিং স্পট খুঁজে নিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে। চাঁদের আবছা আলোয় দেখলাম ইতস্তত কয়েকটা ট্রেলার অর্থাৎ বাড়ির মতো গাড়ি নোঙর করা রয়েছে, একটু দূরে সাদামতন কী একটা দেখে কিটি টর্চ নিয়ে দেখে এসে বলল, ওটা টয়লেট। তখন পাইনগাছের শুকনো পাতা, পাইনকুঁড়ি ও কাঠ-কুচো বিছানো মাটিতে, বিরাট-বিরাট সিকুইয়া গাছের তৈরি করা অন্ধকারের নীচে আমরা তিনজনে তিনটে স্লিপিং ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত হলাম—মুখটি শুধু পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত রেখে।

ঘুম ভাঙতে দেখি সিকুইয়া গাছগুলোর মাথায় সূর্যের আলো এসে লেগেছে, তার উপরে চমৎকার নীল আকাশ। দুটো-একটা ট্রেলার স্টার্ট দিয়ে চলে গেল, আমরা উঠে ব্রেকফাস্টের আয়োজনে লেগে গেলাম। পার্কে সরকারি উনুনে আগুন জ্বালিয়ে কিটি চটপট অমলেট বানিয়ে ফেলল হ্যামের টুকরো দিয়ে। খাবারের ছিটেফোঁটার লোভে চারপাশে ভিড় করল এসে কাঠবিড়ালি আর নীল রঙের মাথায় ঝুঁটিওলা একধরনের পাখি—কিটি বলল ওগুলো স্টেলার্স জে, অর্থাৎ 'জে' (Jay) পাখির একটি গোত্র।

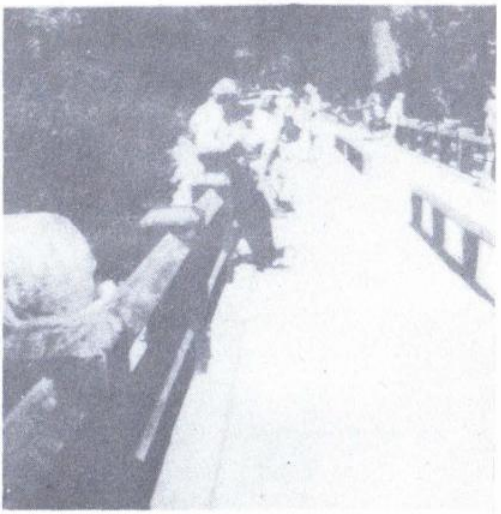

পথের ধারে বিশ্রাম

৭৬০,৯৫১ একর যার আয়তন, সেই বিরাট ন্যাশনাল পার্ক হেঁটে আর কতটা দেখা যায়? তবু হেঁটে না দেখলে এর সৌন্দর্য তোমার চোখে খুলবেই না। একাধিক 'ট্রেল' আছে হাঁটবার জন্য যেগুলো জুড়লে সাতশো মাইল রাস্তা দাঁড়ায়। 'ইয়োসিমিটি ভিলেজ'-এর ভিজিটার্স সেন্টার থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। একটু হেঁটে এসে পৌঁছুলাম

ইয়োসিমিটি জলপ্রপাত

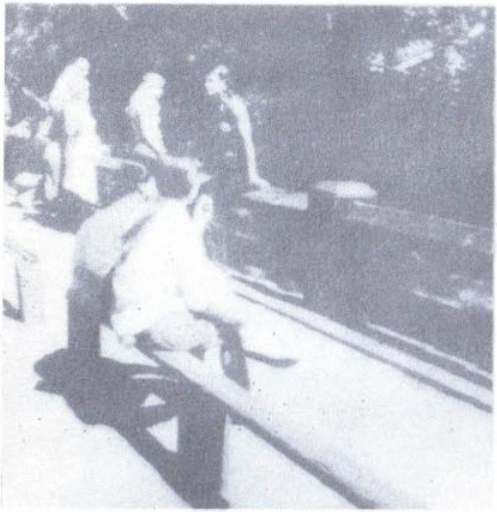

মারসিড নদীর উপরকার ছোট্ট ব্রিজটিতে, তার নাম সেণ্টিনেল ব্রিজ। এই ব্রিজের উপর থেকেই চমৎকার চোখে পড়ে 'হাফ ডোম' নামে বিখ্যাত শৃঙ্গ—মনে হয়, তার আধখানা কে যেন কেটে উড়িয়ে দিয়েছে—তাই ওই নাম। আমরা একটা ট্রেন ধরে এগুতে লাগলাম ইয়োসিমিটি জলপ্রপাত লক্ষ করে। দুপাশে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়, কখনো পাইন, ফার

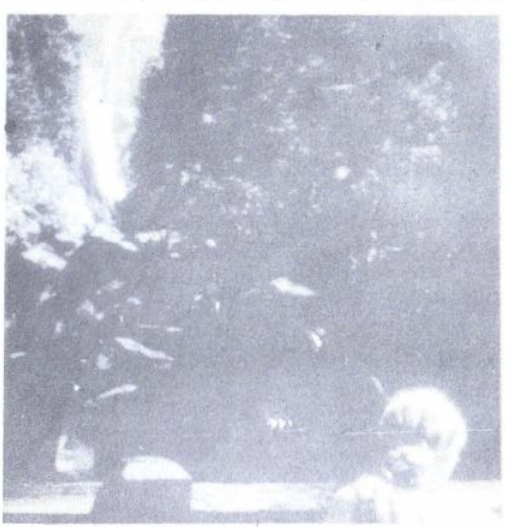

আস্পেন বা অন্যান্য গাছ গা-জুড়নো ছায়া দিচ্ছে মাথার উপর, কখনো পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমরা হাঁটছি। পিঠে ব্যাগ বাঁধা, পায়ে কেড্‌স, ওদেশে যাকে বলে 'স্নিকার্স'। ইয়োসিমিটি জলপ্রপাত আসলে দুটো—একটা খানিকটা উপরে, নাম 'আপার ফলজ', আরেকটা খানিকটা নীচে—সেটা 'লোয়ার ফলজ'। উপরেরটাই দূর থেকে বেশি দেখা যায়। নীচেরটা দেখতে হলে যতটা হাঁটতে হয় ততটা হাঁটার দম আমাদের ছিল না, তাই খানিকদূর গিয়েই আমরা ফেরার পথ ধরলাম। হঠাৎ কিটি পথের ধারে একটি ঝাড়মতন গাছ দেখিয়ে বললে, "এটা কী গাছ জানো?" আমরা সিধে 'না' বলতেই কিটি হেসে জানালে ওটা লরেল গাছ। তখন আমরা খুব উৎসাহে একটি-দুটি পাতাসুদ্ধ ডাল ছিঁড়ে নিলাম—প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক বিজয়ীদের যে ঐ লরেল পাতার মুকুট পরানো হত তা তো আমরা জানি।

গাড়িতে করে গ্লেসিয়ার পয়েণ্ট রোড ধরে আমরা উঠে গেলাম চুড়োয়, যার নাম গ্লেসিয়ার পয়েণ্ট। এইবার ইয়োসিমিটি তার মহৎ সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হল। ঐ যেন এক ধারে দেখতে পাচ্ছি ইয়োসিমিটি প্রপাতকে, উত্তরে। ডান-দিকে এক চিলতে দেখছি নেভাদা প্রপাতকে—আরেকটা যেন জলধারা ঝরছে ওই দিকেই, ওটা কী? কিটি বললে ওটা হল "ভারনাল ফল্‌জ"। কী দেখবে? দ্যাখো শুধু গ্লেসিয়ার, মসৃণ করে দেওয়া সাদা-কালো ধূসর রঙের অজস্র শৃঙ্গ। ঐ তো হাফ ডোম দেখছি স্পষ্ট, একটু আড়ালে নর্থ ডোম লুকিয়ে উঁকি দিচ্ছে যেন! একটু বাঁ-দিকে সরল ও উন্নত চুড়ো 'এল কাপিতান'—ক্যাপ্টেন মশাই, আর নীচে দ্যাখো সবুজ হয়ে থাকা উপত্যকা ধু ধু করছে। ওখান থেকেই কি আমরা উঠে এলাম? 'হাই সিয়েরা' পর্বত-মালা ঢেউ তুলে ছড়িয়ে গেছে দিগন্তে, একটু পিছনে তাকালেই দেখতে পাবে হেমন্তে লাল হয়ে থাকা ফার গাছের অরণ্য। এই হল ইয়োসিমিটি। অজস্র গ্র্যানাইটের শৃঙ্গ, ছিটকে ছড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত, বিচিত্র গঠনের পাথর, দৈত্যের মতো দেখতে সিকুইয়া গাছের সমাবেশ, নদী ও হ্রদ, সবুজ ও স্নিগ্ধ উপত্যকা। আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা—

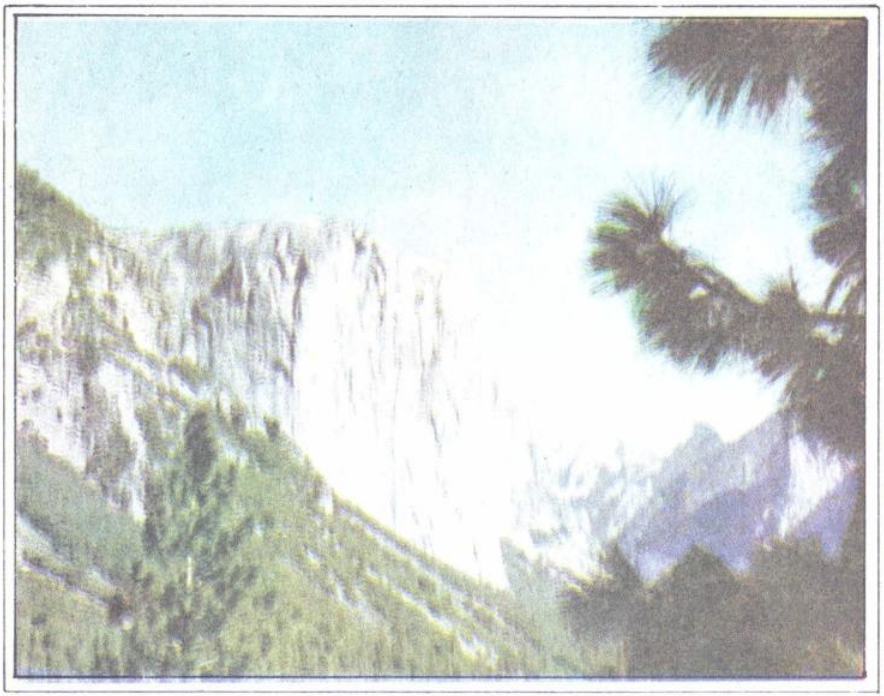

এল কাপিতান

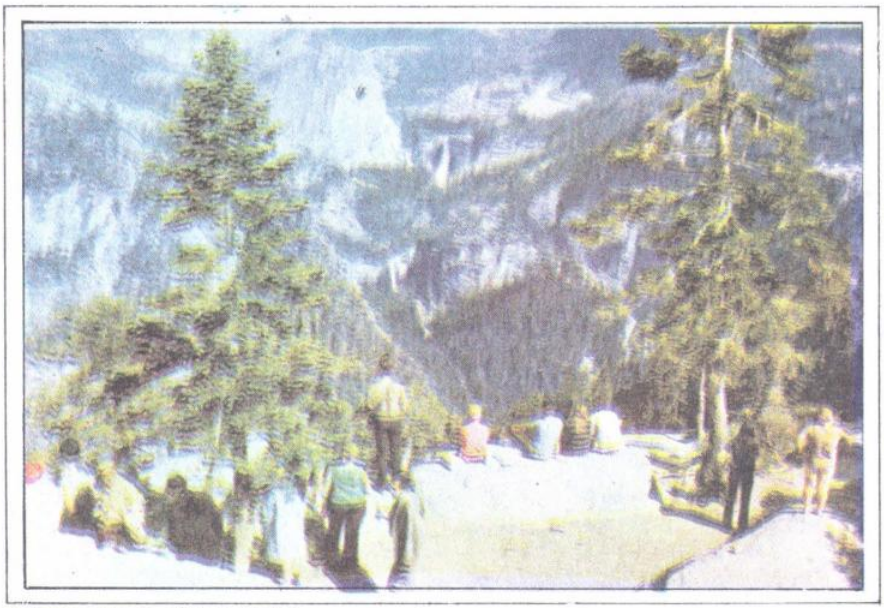

গ্লেসিয়ার পয়েন্ট। নীচে জলপ্রপাত

পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য মার্কিনদেশের অন্যান্য জায়গায় যে-সব বিশ্রী বাজার গড়ে ওঠে—নায়াগ্রা জলপ্রপাত যার উদাহরণ —এখানে তার কোনো চিহ্ন নেই। পৃথিবী তার অম্লান সৌন্দর্য নিয়ে এখানে বিশ্রাম করছে—মানুষ এখানে যায় অতি সন্তর্পণে, তীর্থযাত্রীর শ্রদ্ধা নিয়ে, তার হাত এই অনুপম লাবণ্যকে নোংরা করতে সাহস পায় না। ভিজিটর্স সেণ্টারে রেড ইণ্ডিয়ানদের হস্তশিল্পের একটি ছোট্ট দোকান আছে, একটি ক্যানটিনের মতো, তা ছাড়া সমস্ত পর্বত ও উপত্যকা বিপণিহীন, ব্যবসায়ীর বাণিজ্য প্রদর্শনী প্রায় কোথাও নেই। সেইজন্যই কি 'ইয়োসিমিটি' কথাটির মানে 'অনুপমা'?

গ্লেসিয়ার পয়েন্ট থেকে নামতে নামতে কিটি আমাদের এদিক-ওদিক আঙুল তুলে দেখাতে লাগল। উত্তরে এল কাপিতানের পাশ দিয়ে উপত্যকায় একটা চক্কর মেরে আমরা সোজা দক্ষিণে নেমে গেলাম খানিকটা—মারিপোজা গ্রোভ-এ দৈত্যাকার সিকুইয়া গাছ দেখে আসতে। একটি গাছের গুঁড়ি কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে — তার নাম ওয়াওনা টানেল ট্রী। একটি গাছের গুঁড়িতে আগুন লেগে তার একটা দু-ঠেঙে চেহারা দাঁড়িয়েছে, সেটি নাম পেয়েছে ক্লোদ্‌সপিন ট্রী। কিটি বলল, 'এবার তোমাদের দেখাব সেই গাছটি, যেটির মতো ফোটো পৃথিবীতে আর কোন গাছের তোলা হয়নি।"

আমরা বললাম, "সেও কি সিকুইয়া গাছ?"

কিটি বলল, "না, সেটি একটি পাইন, জেফ্রি জাতের পাইন। সেণ্টিনেল ডোমের মাথায় আছে সেটি। চলো, সেখানে যাই।"

সেণ্টিনেল ডোমে পেঁাছে, সেই পাইনের তলা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সূর্যাস্ত দেখলাম।

এই বেড়ানোর বছর আটেক পরে, গত বছর কলকাতায় আমার বাসায় আমার স্ত্রী পাখি দেখার দুরবিনটার বাক্স খুলে দেখে তাতে কয়েকটা শুকনো পাতা, ডাঁটি থেকে খসে পড়েছে। এ কোত্থেকে এল? কে রেখেছিল ওগুলো ওখানে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওগুলো সেই যত্নে ছিঁড়ে আনা লরেল - পল্লব, ইয়োসিমিটি থেকে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে এই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে এসে পেঁাছেছে। সে পাতা আর ফেলা হল না।

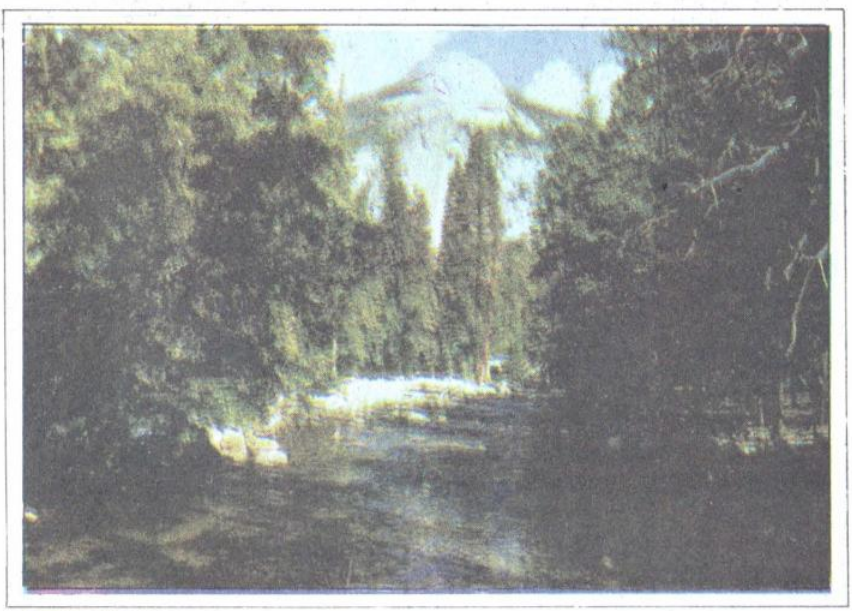

গাছপালার ফাঁকে নথ ডোম

কালো ঘোড়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন, নাকি সত্যিসত্যি ঘটেছিল, বলা কঠিন। শুধু এটুকুই বলতে পারি, এ-ঘটনা আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না। যা-যা ঘটেছিল, অবিকল তাই-তাই বর্ণনা করছি।

গত শরৎকালের কথা। তখন আমি মার্কিন মুলুকের কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ পাড়াগাঁয়ে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে আছি। ভদ্রলোকের নাম ডঃ হেরম্যান জুট্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে হিটলারের চেলারা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে ডঃ জুট্রাম আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। কারণ উনি ইহুদি।

এলাকার নাম মুনভিলে। মানে করলে হয়তো দাঁড়ায় চন্দ্রপুরী। আসলে নিঝুম কয়েকটা বনে-ঢাকা ছোট্ট টিলার ওপর একটা করে বাড়ি। হাইওয়ে থেকে কষ্টেসৃষ্টে তাকালে নজর পড়ে। চারিদিকে ছড়ানো ঢেউ খেলানো মাঠ। কোথাও ধূসর হয়ে ওঠা ভুট্টাখেত। কোথাও গোরু, শুয়োর বা ঘোড়ার বাথান—চারিদিক কাঠের বেড়ায় ঘেরা।

মুনভিলে নাম কেন?

ডঃ জুট্রাম আমার প্রশ্ন শুনে বলেছিলেন, "ওই যে নীচের দিকে হ্রদটা দেখছ, ওটার গড়ন লক্ষ করো।"

বাড়ির পুবে টিলাটা ফাঁকা এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তারপর হ্রদ। পুবের ঘাসে-ঢাকা লন ও ফুলবাগিচায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। দেখলাম, হ্রদটা অর্ধবৃত্তাকার। তার মানে, অবিকল চন্দ্রকলার মতো। বলেছিলাম, "হ্রদটার নাম হওয়া উচিত মুনলেক।"

"ঠিকই ধরেছ।" ডঃ জুট্রাম হেসে উঠেছিলেন। "ওটার নাম মুনলেক। তবে তার চেয়েও সুখের কথা, মুনলেকের ধারে জ্যোৎস্নারাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলে তুমি রূপকথার রাজপুত্তুরটি হয়ে উঠবে।"

হাসতে হাসতে বলেছিলাম, "কিন্তু রাজপুত্তুরের যে একটা ঘোড়াও চাই। যেমন-তেমন ঘোড়া চলবে না, চাই একটি পক্ষিরাজ সেই যে, যাদের ডানা আছে..."

বলতে বলতে একটু অবাক হয়ে থেমেছিলাম। ডঃ জুট্রামের লালচে মুখে হঠাৎ কেন অমন গাঢ় ছায়া—যেন হঠাৎ কী অসুখ বাধিয়ে বসেছেন। ঠোঁটদুটো কাঁপছে। চোখ নিষ্পলক।

ব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, "আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ডঃ জুট্রাম?"

উনি তখনই ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো কাঁধদুটো নাড়া দিয়ে আগের হাসিটা ফিরিয়ে এনেছিলেন।..."হ্যাঁ, তুমি ঘোড়ার কথা বলছিলে। তাই না?"

"হ্যাঁ, ডঃ জুট্রাম।"

"জানো? মুনলেকের অদ্ভুত-অদ্ভুত সব গল্প আছে। তার মধ্যে ওই ঘোড়ার গল্পটা সাংঘাতিক। মাঝেমাঝে—বিশেষ করে জ্যোৎস্নার রাতে নাকি হ্রদের জল থেকে একটা কালো ঘোড়া উঠে আসে। ঘোড়াটা নাকি প্রাচীন যুগের এক রেড ইন্ডিয়ান

সর্দারের। নিছক ভুতুড়ে ব্যাপার।..."

বলে ডঃ জুট্রাম হাতঘড়িটা দেখে নিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।..."কী কান্ড! আমাকে যে এক্ষুনি শহরে দৌড়ুতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?"

ডঃ জুট্রাম পা বাড়িয়ে ফের বলেছিলেন, "থাক গে, তোমার গিয়ে কাজ নেই। পন্ডিতী কচকচি তোমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করো। আয়ু বাড়বে।"

হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলেন ডঃ জুট্রাম। একটু পরে বাড়ির দক্ষিণে বনের গড়ানে রাস্তায় ও'র সাদা গাড়িটা নেমে যেতে দেখেছিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে-তিনটে। টিলার মাথায় কাঠের দোতলা বাড়িটা আরও নিঃঝুম হয়ে গেল। গাছপালা থেকে ঝিঁঝি-পোকার বিকট হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। মার্কিন ঝিঁঝিপোকার ডাক বড্ড বিরক্তিকর। মনে মনে খাপ্পা হয়ে বললাম, রোসো বাছাধনরা! ফল্ অর্থাৎ পাতা ঝরার দিন শুরু হলেই তোমাদের বীরত্ব কোথায় থাকে, দেখা যাবে।

ডঃ জুট্রামের প্রকান্ড কুকুরটার নাম রেক্স। একে কুকুরকে আমার প্রচন্ড ভয়, তাতে রেক্স আমাকে যতবার দেখে, মাতৃভাষায় গালা-গালি করে। বাঁধা না থাকলে আমাকে নিশ্চয় সোজা ভারতে ফেরত পাঠিয়ে ছাড়ত। কাঁচুমাচু মুখে ডঃ জুট্রাম বলেছিলেন, রেক্সের এই এক দোষ। বিদেশীদের দেখতে পারে না।

হাই তুলে ভয়ে-ভয়ে বারান্দায় উঠলাম। কিন্তু রেক্সের সাড়া পেলাম না। তখন দরজা খুলে বসার ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। সিঁড়ির পাশে কুকুরটা থাকে। সেখানে সে নেই। তাহলে ডঃ জুট্রামের সঙ্গে লেকচার শুনতে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দোতলায় আমার ঘর। বেলা দুটোয় লাঞ্চ খেয়েছি। বাঙালি স্বভাবে ভাতঘুম নামে আরামদায়ক একটা ব্যাপার আছে। সায়েবদের সংসর্গে সেটা বরবাদ হতে বসেছে। আজ এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। অতএব সটান বিছানায় চিত হলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্ধুবর ভাতঘুম এসে কোলাকুলি করলেন। তখন আঃ, কী আনন্দ। কতদিন পরে দেখা।

কতক্ষণ পরে কার ডাকাডাকিতে চোখ খুলতে হল। তাকিয়ে দেখি, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আট ন বছরের একটা মেয়ে। গোলগাল পুতুল-গড়ন। একমাথা ঝাঁকড়মাকড় সোনালি চুল। পরনে উজ্জ্বল নীল ফ্রক। গলায় সাদা স্কার্ফ জড়ানো। মেয়েটা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, আরে তাই তো! এরই ছবি বাড়ির ওপরে-নীচে সব ঘরে দেখেছি। ওই তো এ-ঘরের দেয়ালেও রয়েছে। ডাঃ জুট্রামকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। ভুলে গেছি।

উঠে বসে মিষ্টি হেসে বললাম, "হাই!"

আমার মার্কিনি সম্ভাষণের জবাবে ছোট্ট করে বলল, "হাই!" কিন্তু মুখের অবাক ভাবটা ঘুচল না। ঠোঁট কামড়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে হঠাৎ একটু হাসল।

হেসে বলল, "তুমি নিশ্চয় বাবার অতিথি। তুমি কি বিদেশী?"

সায় দিয়ে বললাম, "প্রথমে তোমার নাম বলো।"

"জিনা।"

"তুমি নিশ্চয় শহরে থেকে পড়াশুনো করো, তাই না জিনা?" ওর সঙ্গে খাতির জমাতে বসলাম। "তা এলে কার সঙ্গে? মায়ের সঙ্গে বুঝি? চলো, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।"

ডঃ জুট্রাম তাঁর স্ত্রী কিংবা মেয়ের কথা কিছু বলেননি। আমিও কিছু জানতে চাইনি। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাওয়া ভদ্রতাসম্মত নয়।

উঠে দাঁড়িয়েছি, জিনা বলল, "তুমি বললে না কোন দেশের লোক?"

"আমি ইন্ডিয়ান।"

শুনেই জিনা যেন চমকে উঠল। বলল, "তুমি ইন্ডিয়ান। কিন্তু..."

"কিন্তু কী বলো তো জিনা?"

"তোমার মাথায় পালকের টুপি নেই। গলায় রঙিন পাথরের মালা নেই।" জিনা বলতে থাকল। "তোমার বর্শা কই? তোমার চুল কেটে ফেলেছ কেন? তুমি এমন বেঁটে মানুষ কেন?"

ওকে থামিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, "জিনা, জিনা! আমাকে বলতে দাও। ইন্ডিয়ান মানে আমি ইন্ডিয়া—ভারতের লোক। তুমি আমাকে রেড ইন্ডিয়ান ভেবেছ দেখছি। ভারতের নাম শোনোনি? পুবের দেশ।"

জিনা কেমন যেন নিরাশ গলায় বলল, "ও! তুমি ওরিয়েন্টাল।"

"ঠিক বলেছ। এবার চলো, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।"

জিনা সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে বাস্কেটবল খেলবে?"

"খেলব বৈকি।"

"এসো।" বলে সে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল। তার পেছন-পেছন নেমে নীচের ঘরে কাকেও দেখতে পেলাম না। ঘরের ভেতর ততক্ষণে হালকা আঁধার জমেছে। পুবের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, বেলা পড়ে গেছে। নীলচে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে গাছ-পালার মাথায়। আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুনো

আ মরি বাংলা ভাষা

কলকাতার পথেঘাটে দোকানের মাথায় বাংলা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে আজকাল। সেটাই তো নিয়ম। যে দেশে যে ভাষা। কিন্তু লজ্জার কথা হল এই যে ছোট একটা নাম, রাস্তা ও দোকানের নম্বর এইটুকু লেখার মধ্যেই চোখে খট্‌কা লাগে। খট্‌কা লাগে ভুল বানান দেখে।

'খট্‌কা' বলছি কারণ এটা একটা আন্তরিকতার প্রশ্ন। যে ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, যে ভাষায় বাঙালী প্রতিনিয়ত তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, কোলাহল, শোক, ক্রোধ ব্যক্ত করছে আজীবন ধরে, সেই ভাষাতে একটা নাম লিখতে এই প্রমাদ কেন? তার মানে কি বাঙালী নিজের ভাষাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না? অথচ এই তো সেই বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দের সোনারকাঠি ছোঁয়া বাংলা ভাষা। আদি এবং অকৃত্রিম।

কথাটা তোমরা ভেবে দেখো। বানান ব্যবহারের সময় সন্দেহ হলে অভিধান দেখে নিও। আর রাস্তার আশে পাশে ভুল বানানের সাইনবোর্ড দেখলে বিনীত ভাবে দোকানের মালিককে গিয়ে অনুরোধ কর তা সংশোধন করে দিতে। কেমন?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ, ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

হাঁসের ঝাঁক। নীচের দিকে একটু দূরে মুনলেকের জলে তখনও লালচে ছটা ছড়িয়ে আছে।

"হেই! এখানে চলে এসো।"

ঘুরে দেখি লনের কোনায় বাস্কেটবল নিয়ে জিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে খেলায় মেতে গেলাম। মেয়েটি বড় চঞ্চল প্রকৃতির। আমার আনাড়িপনায় খিলখিল করে হেসে উঠছিল। আমাকে গোহারা করে হারিয়ে ছাড়ল। আবছা আঁধার হয়ে এলে বললাম "এই যথেষ্ট। সকালে আবার হবে। তখন তোমায় হারিয়ে দেব।"

জিনা লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন আনমনা।

বললাম, "জানো জিনা? অবিকল তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। তার নাম কী জানো? নিনা। তোমরা দুজনে পেনফ্রেন্ড হতে পারো।"

আনমনা জিনা বলল, "আই লাইক হার।" তারপর হঠাৎ পা বাড়াল। "আমার সঙ্গে লেকে যাবে? তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। ভারী মজার। এসো না।"

সে গেট খুলে ঢালু সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি দিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল। চেঁচিয়ে বললাম, "জিনা, আস্তে, আস্তে। দৌড়িও না, আছাড় খাবে।"

ততক্ষণে সে লেকের ধারে বালির চওড়া বীচে পৌঁছে গেছে। আমার যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল বীচে পৌঁছে টের পেলাম কনকনে ঠান্ডায় রক্ত জমতে শুরু করেছে। মেয়েটা কিন্তু দিব্যি ছোটাছুটি করছে বালিতে। হঠাৎ চোখ গেল হ্রদের ওপারে টিলার মাথায়। বাঁকা এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। তখুনি ডঃ জুট্রামের গল্পটা মনে পড়ল। কেমন অস্বস্তি জাগল। বললাম, "জিনা! এবার ফেরা যাক।"

জিনা জবাব দিল না। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেইসময় হু-হু করে একটা বাতাস এল। ঠান্ডাটা বেড়ে গেল। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলাম। কী শীত, কী শীত! দস্যি মেয়েটার পাল্লায় পড়ে শেষ অব্দি না নিমুনিয়া বাধাই।

হ্রদের জলটা কাঁপছে। আবছা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে সারা হ্রদ। তারপর একসঙ্গে অসংখ্য বুনো হাঁস প্যাক-প্যাক করে ডেকে উঠল। তারপর যা দেখলাম, সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। শীতের কথা ভুলে গেলাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো?

যেন জলের ওপর দিয়েই হেঁটে এল একটা কালো ঘোড়া। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত একটা কালো ঘোড়া।

ঘোড়াটা বীচে আসতেই জিনা কী দুর্বোধ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দেখি, কালো ঘোড়াটার সঙ্গে সে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও আমার সামনে দিয়ে কখনও পিছন দিয়ে দুজনে ছোটাছুটি করতে থাকল। ঘোড়াটা আমার উপর এসে পড়বে ভেবে আমি আতঙ্কে কাঠ। কিন্তু গলায় কী আটকে গেছে। জিনাকে বারণ করার সাধ্যও নেই।

একটু পরে দেখলাম, জিনা কালো ঘোড়াটার ওপর চেপে বসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় সারা বীচ জুড়ে খালি ঘোড়ার পায়ের চাপা শব্দ।

তারপর পেছনে ওপর দিক থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে শুনলাম। সেইসঙ্গে কুকুরের গর্জনও শুনতে পেলাম। টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল আমার গায়ের ওপর। সেই আলোর ছটায় আবছা দেখলাম, কালো ঘোড়াটা জিনাকে নিয়ে হ্রদের জলে নেমে যাচ্ছে। এতক্ষণে গলা দিয়ে স্বর বেরুল। চেঁচিয়ে উঠলাম, "জিনা জিনা জিনা!"

পেছনে ডঃ জুট্রাম বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, "কাম ব্যাক! কাম ব্যাক, ইউ ফুল!"

তারপর আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। রেঞ্জ জলের ধারে দাঁড়িয়ে তখনও গরগর করছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফায়ার প্লেসের সামনে দুজনে চুপচাপ বসে আছি। একসময় দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ডঃ জুট্রাম বললেন, "তুমি জিনা জিনা বলে ডাকছিল। তুমি কি ওকে সত্যিই দেখেছিলে? পরনে নীল ফ্রক, গলায় সাদা স্কার্ফ ছিল। তাই না?"

"হ্যাঁ আর সেই কালো ঘোড়াটাও।"

কথা কেড়ে ডঃ জুট্রাম বললেন, "দশ বছর আগে জিনা মুন লেকে ডুবে মরেছে। তার একবছর পরে ওর মা রোগে ভুগে মারা যায়। আমিও মুনভিলেতেই মরতে চাই। তাই এখানে একা পড়ে আছি। বলতে পারো, ওয়েটিং ফর দি ব্লাক হর্স।"

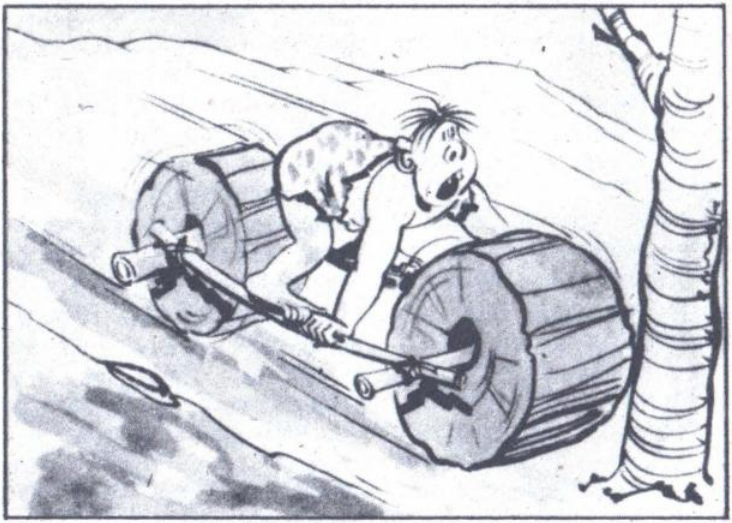

মানুষের প্রথম আবিষ্কার হ'ল চাকা

এবং এমনি আরো আরো আবিষ্কারের গল্প
দু'টি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করেছি। বইটি :
'যেসব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে', প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা

এমনিতর নানা বই। নানা অজানা বিষয় নিয়ে। যে সব বই তোমাদের পড়তে ভালো লাগবে
এবং যে সব বন্ধুদের দিতেও ভালো লাগবে। কেননা—

বই পড়াও ভাল দেওয়াও ভাল

আমাদের বই :

সোনার অভিযান
নদী কথা
আমাদের রেলের কথা
ডাকটিকিটের মজার কাহিনী
চলো যাই চিড়িয়াখানা
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি
প্রেমচন্দ
ফুল ও মৌমাছি
রোহাল্ডা ও নন্দিয়া
যুগে যুগের কাহিনী
কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়
রেডক্রশ কাহিনী
আমাদের নৌবাহিনী
আমাদের বিমানবাহিনী
এককড়ির সাধ

এবং এমনিতর প্রায় আধশ' বই। দাম হয় দেড় টাকা, নয়ত আড়াই টাকা। ব্যাস

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক নয়াদিল্লি-১১০০১৬
এন বি টি বুক সেণ্টার, ৬৭/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯

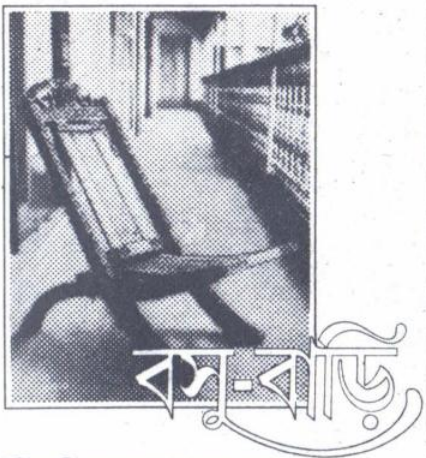

শিশিরকুমার বসু

॥ ২২ ॥

এটা তো সকলেই জানেন যে, প্রথম জীবনে রাঙা-কাকাবাবু সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্বে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং এক সময়ে ভেবেছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন কিনা। ১৯৩৬-এ কার্শিয়াঙে পারিবারিক নানা সমস্যা বা পরিবারের বিভিন্ন লোকের বা ছেলেমেয়েদের আচার-ব্যবহার, লেখাপড়া, কেরিয়ার ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠত। তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যেত যে, তিনি প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনের ধারা ও আচরণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। এমন কী আমাদের জেনারেশনের যে-কোনো ছেলে বা মেয়ের স্বভাব-চরিত্রের ও আচরণের বেশ একটা ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারতেন। কার চরিত্রের কোন দিকটা সবল, কোন দিকটা দুর্বল, এসব বিষয়ে তাঁর নিজের একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল। নিজের জেনারেশনের লোকেদের সম্বন্ধে তিনি আমাদের সামনে আলোচনা করতেন কম, কিন্তু আমার ধারণা সেক্ষেত্রেও তাঁর মতামত খুব পরিষ্কার ছিল। তিনি তো অন্যদের মতো সংসারে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু পারিবারিক কোনো সমস্যা বা কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কথা উঠলে তিনি একটা কথা বারবার আমাদের বলতেন, সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে "উদার হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।" তিনি আমাদের বোঝাতে চাইতেন যে, ছোটখাটো, অপ্রিয় বা হিংসাপ্রসূত যা-কিছু আছে সেগুলি উদার মনোভাব নিয়ে উপেক্ষা করতে না পারলে সাংসারিক বা সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে বাধ্য।

ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে, ভিন্নভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলে বিশ্ব-রাজনীতির ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাঙা-কাকাবাবুর বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। এ-ব্যাপারে আমাদের অধিকাংশ নেতার অনীহা ও অজ্ঞতা তাঁকে পীড়া দিত। একদিকে তখন তো জাপান ছাড়া এশিয়ার ও আফ্রিকার প্রায় সব দেশই ছিল পরাধীন। অন্য দিকে আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে নিস্পৃহ। সেজন্য ইউরোপীয় রাজনীতি ভাল করে না বুঝলে বিশ্বরাজনীতির রূপ ও গতি বোঝা সম্ভব ছিল না। আমাদের লড়াই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কোন্ কোন্ নতুন শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ বা খর্ব করতে পারে, এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হতে পারে এ-বিষয়ে রাঙা-কাকাবাবু গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁর চিন্তাধারা দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের থেকে পৃথক ছিল, ফলে তাঁর কাজের ধারাও অন্য স্রোতে বইত। আদর্শবাদ ও ব্যবহারিক রাজনীতির বেশ একটা সমন্বয় তিনি করতে পেরেছিলেন। আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা তাঁর লেখা ও কর্ম-জীবন থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

রাঙা-কাকাবাবুর কথাবার্তা থেকে মনে হত না যে, তাঁর ছেলেবেলাটা শান্তিপূর্ণ ছিল। ইস্কুল-কলেজ যাওয়া-আসা করা, পরীক্ষা পাস করা, বৃত্তি পাওয়া গতানুগতিক এসব নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তাঁর ভিতরে নিজের বিবেকের সঙ্গে ও বাইরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করতে-করতে তিনি বড় হয়েছিলেন। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই হয়। আমাদের দেশের অন্য অনেক নেতার ক্ষেত্রে

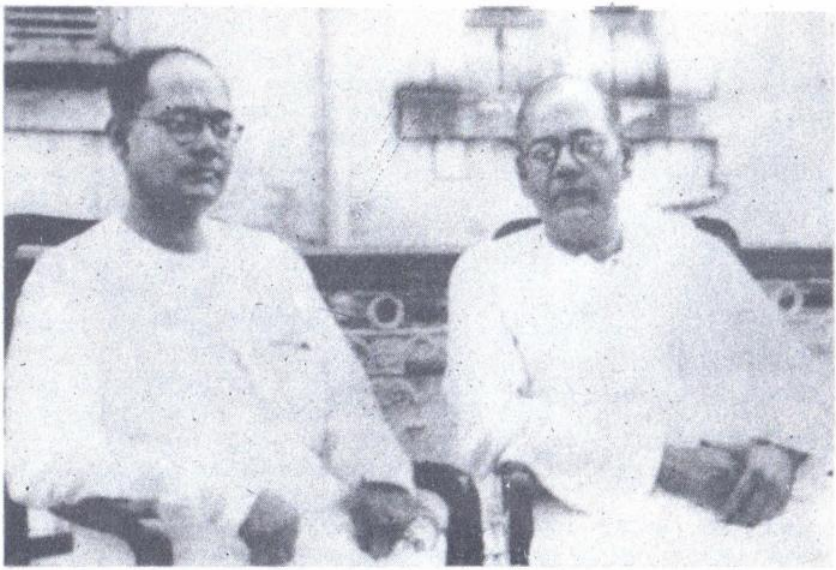

এলগিন রোডের বাড়ির গাড়িবারান্দার ছাদে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র (১৯৩৭)

দেখেছি, পরিণত বয়সে বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার ফলে অথবা হঠাৎ বিশেষ কারুর ডাকে সংগ্রামের পথে চলে আসেন। রাঙা-কাকাবাবু কিন্তু ছিলেন সত্যই আজীবন সংগ্রামী। এ-কথাটি আমি প্রথম বুঝি ১৯৩৬ সালে কার্শিয়াঙের আঁকাবাঁকা পথে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে।

১৯৩৬-এর শেষের দিকে সরকার রাঙা-কাকাবাবুকে কলকাতায় নিয়ে এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেয়। তাঁর শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। তাছাড়া শীতের সময় কার্শিয়াঙে থাকাটা খুব সুখেরও নয়। মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন সময়ে কত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী বা বিপ্লবী যে বন্দী হয়ে থেকেছেন, তার ইয়ত্তা নেই, এর একটা হিসেব নিলে হয়। পরে ১৯৪২-এ আন্দোলনের সময় আমার নিজেরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ১৯৩৬-এ আমরা দল বেঁধে সরকারের অনুমতি নিয়ে মেডিকেল কলেজে রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাবা তখন নতুন সাধারণ নির্বাচনের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। বেশ বোঝা যেত, রাঙা-কাকাবাবু বাবার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য ছটফট করতেন, নানাভাবে বাবার কাছে নির্বাচনের প্রচার সম্বন্ধে বা কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন সম্বন্ধে নিজের মতামত পাঠিয়ে দিতেন।

মা-জননীর শরীর তখন ভাল নয়, নিয়মিত মেডিকেল কলেজে গিয়ে রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পরে সরকার রাঙা-কাকাবাবুকে পুলিস পাহারায় এলগিন রোডের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে আসত, আবার ফেরত নিয়ে যেত। তাঁকে দেখবার জন্য সেই সময় বাড়িতে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের বেশ ভিড় হত।

১৯৩৬এ ইউরোপ থেকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এক অতিথি এলেন, রাঙা-কাকাবাবুরই আমন্ত্রণে। ভিয়েনার শ্রীমতী হেডি ফুলপ-মিলার। রাঙা-কাকাবাবু ভিয়েনাতে থাকার সময় শ্রীমতী ফুলপ-মিলার তাঁকে খুবই দেখশুনো করেছিলেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের দর্শন, কলা ও কৃষ্টির প্রতি তাঁর টান ছিল গভীর। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনিও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাঙা-কাকাবাবুকে দেখতে যেতেন। শ্রীমতী ইউরোপীয় অপেরা সঙ্গীতে পারদর্শিনী

ছিলেন এবং কলকাতার রেডিওতে তিনি গানও গেয়েছিলেন। সমঝদারেরা তখন বলেছিলেন, অত উঁচু মানের ইউরোপীয় সঙ্গীত তখনও পর্যন্ত কলকাতার রেডিও স্টেশন থেকে কমই প্রচারিত হয়েছে। আমাদের বাড়িতে অতিথি থাকার ফলে শ্রীমতী ফুলপ-মিলারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাড়ির সব ছেলেমেয়েকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি চিরকাল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, এবং ইউরোপে পরে আমাদের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।

১৯৩৭ সালে এপ্রিলে রাঙা-কাকাবাবু মুক্তি পেলেন। মুক্তির পর স্বাস্থ্যের জন্য তিনি কিছুদিন ডালহাউসি পাহাড়ে ধরমবীর-দম্পতির সঙ্গে কাটিয়ে আসেন। ছাত্রজীবনে, ১৯২০-২১ সালে, ইংল্যান্ডে ডাক্তার ও শ্রীমতী ধরমবীরের সঙ্গে রাঙা-কাকাবাবুর পরিচয় হয়। শ্রীমতী ধরমবীর ছিলেন ইংল্যান্ডবাসী রাশিয়ান মহিলা। তাঁর মাতৃসুলভ ব্যবহার ও চরিত্রের মাধুর্যে রাঙা-কাকাবাবু যে শুধু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয়; দিলীপকুমার রায়ের মুখে শুনেছি, শ্রীমতী ধরমবীরকে দেখার পর ইউরোপীয় মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও মতামতের পরিবর্তন ঘটে। এর আগে রাঙা-কাকাবাবুরই আমন্ত্রণে এক ধরমবীর-কন্যা বেশ কিছুদিন আমাদের সঙ্গে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করেছিলেন। সেই সময় আমরাও শ্রীমতী ধরমবীরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ড্যালহাউসি থেকে ফিরে রাঙা-কাকাবাবু পুরোপুরি আবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩৭-এর অকটোবরে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হবে। তার আগেই সব ব্যবস্থা করতে পুজোর সময় তিনি কার্শিয়াঙে বাবার সঙ্গে মিলিত হলেন। (ক্রমশ)

জ্যোৎস্নারাতে

শঙ্খ ঘোষ

নামতা ভুলে আমতা গেলে
সামতাবেড়ের গা-য়
শালুক মুখে ভালুক উঠে
দাঁড়াচ্ছে জ্যোৎস্নায়!
চুক্তি করে নিক্তি মেপে
দোক্তা যদি খায়
জ্যোৎস্নারাতে পোষ মানাতে
স্বগ্‌গে চলে যায়!

ছবি দেবাশিস দেব

দাদুর পার্টি

মিহির সিংহ

স্যার বলেন, পরিষ্কার ভেবে, পয়েন্ট বাই পয়েন্ট লিখবে। প্যারাগ্রাফ ভেঙে প্যারার মাথায় সাবহেডিং দিয়ে আন্ডার-লাইন করবে, তা সে হিস্টরি জিওগ্রাফি আনসারই হোক বা বাংলা এসে-ই হোক। হ্যাজোড়-ব্যাজোড় এককাঁড়ি লিখলে চিন্তা-গুলোই জবড়জং হয়ে যায়। অকারণ জ্ঞানও দেবে না। তাতে আন্টি বিরক্ত হবেন।

সারা বছর এই লাইনে প্র্যাকটিস করে, অ্যালজেব্রা এরিথমেটিকে লাভ না হলেও অনেক সাবজেক্টেই ঝুমি ভাল নম্বর পায়। কালকেই যদি দুম করে ক্লাসওয়ার্ক আসে—নেমন্তন্নবাড়ির উপরে এসে তো ঝুমি স্যাটাস্যাট লিখে দিতে পারে : নেমন্তন্ন কী ও কয় প্রকার, নেমন্তন্নের উপকারিতা ও অপকারিতা, নেমন্তন্নের সহিত পার্টির পার্থক্য কী, ইত্যাদি।

এবং এইরকম পরিপাটি পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও নোট করার ফলেই ঝুমির বিশাল কৌতূহল : 'চায়ে ডাকা' 'চায়ে বলা' ব্যাপারটা কী? ডেকেডুকে বলে-কয়ে নিয়ে গিয়ে কি কেবল চা-ই খাওয়ায়? না, চা আর জলখাবার —বাড়িতে যেমন হয়? নাকি ঐখানেই সত্যি-কারের বড়দের মতন ভাল খাওয়া-দাওয়া, ছোটদের অজান্তে?

নইলে, দুপুরের সন্ধের রাত্তিরের নেমন্তন্নে হামেশাই তাকে ডাকে। অথচ চায়ে ডাকে না কেন? বাড়িতে অবশ্য সে চা পায় না, তবে নেমন্তন্নজাতীয় বাড়িতে কিছুতেই অত ধরাবাধাঁ থাকে না, নেমন্তন্নবাড়ির মাসি-মারা যতই বলুন, 'হাঁ ভাই, বাচ্চাদের জন্য আলাদা রান্না, এক্কেবারে ঝাল ছাড়া'। তাকেও না হয় একদিন চা পরিবেশন করতই।—তা, ওর নোটবুকে চা পরিবেশনের কথা পড়ে বাবুদাদা অমন হাসবেই বা কেন?

বাকি সব কিছুই কিন্তু জানা : পেঁাও-ও-কুড়-কুড় জ্যান্ত সানাই, সামনে চায়ের ভাঁড়ে সিগারেটের ছাই। কিংবা রেকর্ডে বিসমিল্লা চালাচ্ছে টুলটুলদা। আলো-আতর-গয়না-বেনারসি। আগের রাত্তির থেকে ঘেমে-চুমে ভিয়েনে ভাজা বোঁদে আর পান্তুয়া কিংবা কড়কড়ে মাড়ওয়ালা কেটারারদের ফিটফাট পরিবেশন, পরিবেশনওয়ালাদের ডাকাডাকির মজাটাই নেই। বুফে হলে তো সেই মা-ই তোমার ডিশে বিশ্বের খাবার গাদাগাদি করে তুলে দেবেন। তারপর সভ্যভব্য ভাবে বাড়ি ফিরে দেখবে যে, না আছে পড়তে বসার সময়, না হয়েছে শোবার সময়। জন্ম-দিনে আবার কেক-গেমস-হ্যাপি-বার্থডে-আংকেল-আন্টি। ওদিকে কোনো কোনো বড় দিনে বা নিউ ইয়ারে মা-বাবাদের পর্যন্ত মাথায় কাগজের টুপি, হাতে বেলুন কিংবা ক্র্যাকার।

ফুল-নেমন্তন্নে প্রণাম বেশি, এপাশে ওপাশে থুতনি নাড়া খাওয়া—"ওমা! সেই টুকাইয়ের আবার এত বড় মেয়ে।" মা-ও অমনি 'ক্লাস ফাইভ 'ক্লাস ফাইভ' মুখ করে সলজ্জ হাসি। হাফ-নেমন্তন্নগুলো দিনের

আলোয় হলেও হুড়োহুড়ির চান্স বেশি, শির-উঁচু কলাপাতায় ডাল-কালিয়া-দৈ-চাটনিও একাকার হবার রেওয়াজ, নেমন্তন্নের গন্ধ হাত থেকে তিন দিনে উঠবে না। জন্মদিনের পার্টিতে একটু ইংলিশ মিডিয়ামের গন্ধ টুকটাক যে যার বিদ্যে ফলাবে। তবে আলো নিভিয়ে, ফার্নিচার তুলকালাম করে ডার্করুম খেলবার থ্রিলের মতন আর কিছু আছে? তাছাড়া গেস্টরা তো পার্টির শেষে টা-টা করে চলে যাবে, তাদের তো ফের গোছান-গাছান করতে হবে না। উজ্জয়িনীদি অবশ্য চাইলড সাইকোলজি পড়েছে, সে বলে যে, ভাঙচুর করাও শিশুদের স্বভাব। পান্তু আর কিকু তো জাপানে থাকে, ভয়ানক ভদ্র। ওরা তো গাছিবাবুর জন্মদিন দেখে রুমু মাসিকে জিজ্ঞেসই করেছিল, "একেই কি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ বলে?" সত্যি, সেদিন যা জমেছিল, একেবারে ঝিংকুড়কুড়।

কিন্তু চায়ে ডাকলে কী কী ঘটে তার ইনসাইড ইনফরমেশন মিলনা কাঁহাসে?—এনিড ব্লাইটন না হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বইতে? ঝুমি কেবল এইটুকু লক্ষ করেছে যে, ও-পাটটা সাধারণত শনি-রবি কি ছুটির দিনে। বেনারসি আর সোনা-জড়োয়ার বদলে তাঁতের শাড়ি, রুপোর কি ভুটিয়া গয়নায় মাকে ভারী মিষ্টি দেখায়। বিকেল-বিকেল যাবেন, রাত্তিরে খাবার আগেই ফিরে আসবেন। কিন্তু রহস্যটা থেকেই যাচ্ছে।

ঝুমির হতাশ কৌতূহল যখন তুঙ্গে, তখন একদিন বিকেলে পিকি - দাদু এসে চায়ের সঙ্গে বাটাটাপোয়া আর কালাকাঁদ খাচ্ছেন। ঝুমি বারান্দার রেলিঙে বাদুড় ঝুলছে—নজর রয়েছে খেলুড়িরা নামল কি না আর এসে-এসে খাবারে ছোঁ মারছে। মা শেষ অব্দি এক তাড়া লাগাসোর পূর্ব মুহূর্তে ঝুমি সরল আবদার করল, "মা, আমাকে কেউ একবার চায়ে বলুক না?" মা হকচকিয়ে বললেন, "মানে?" কিন্তু ঝুমিকে কিছুর মানে জিজ্ঞেস করলেই বিপদ। জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেবে। তাই ওর মুখ পুরো খুলতে-না-খুলতেই ফিরিস্তি দিতে থাকলেন, গত মাসে কতগুলো নেমন্তন্ন সে খেয়েছে। ঝুমি শিশুর মতন অকপট হয়ে বলল, "বয়ে, বৌ ভাত-টৌ-ভাত তো হচ্ছেই, কিন্তু চায়ে ডাকলে কী হয় তা তো এ জীবনে দেখলাম না।"

দাদু হোহো করে হেসে, বিষম সামলিয়ে বললেন, "সত্যিই তো! মঅস্ত সমস্যা। ঝুমঝুমির জীবনই বৃথা হয়ে যাবে।—কেহ মোরে ডাকে চায়ে, কেহ মোর ডাকে চায় না। তা বেশ তো ভাই, তোমাকে নয় আমিই চায়ে ডাকছি। রবিবার বিকেলে তোমার সময় হবে? আর কে কে যাবেন তোমার সঙ্গে?" ঝুমি শঙ্কিত হয়ে বলল, "মা-বাবাকেও সঙ্গে নিতে হবে নাকি? সত্যি সত্যি চায়ে ডাকছ তো?" দাদু মুখে তুকতুক আওয়াজ করে বললেন, "না তো কি মিথ্যে মিথ্যে? এ তো আর টী-ফর-টু-টু টু ফর টী নয়। দস্তুর মতো টী পার্টি। বন্ধুবান্ধবেরা কে কে যাবেন ঠিক করতে হবে না?" মা বললেন, "আপনি একলা মানুষ, এই একপাল দস্যি আপনাকে বড্ড নাকাল করবে।" দাদু বললেন "ভালই তো, দু ঘণ্টার জন্যে তাহলে একলা থাকব না। আর বাচ্চারা নাকাল করবে কেন?

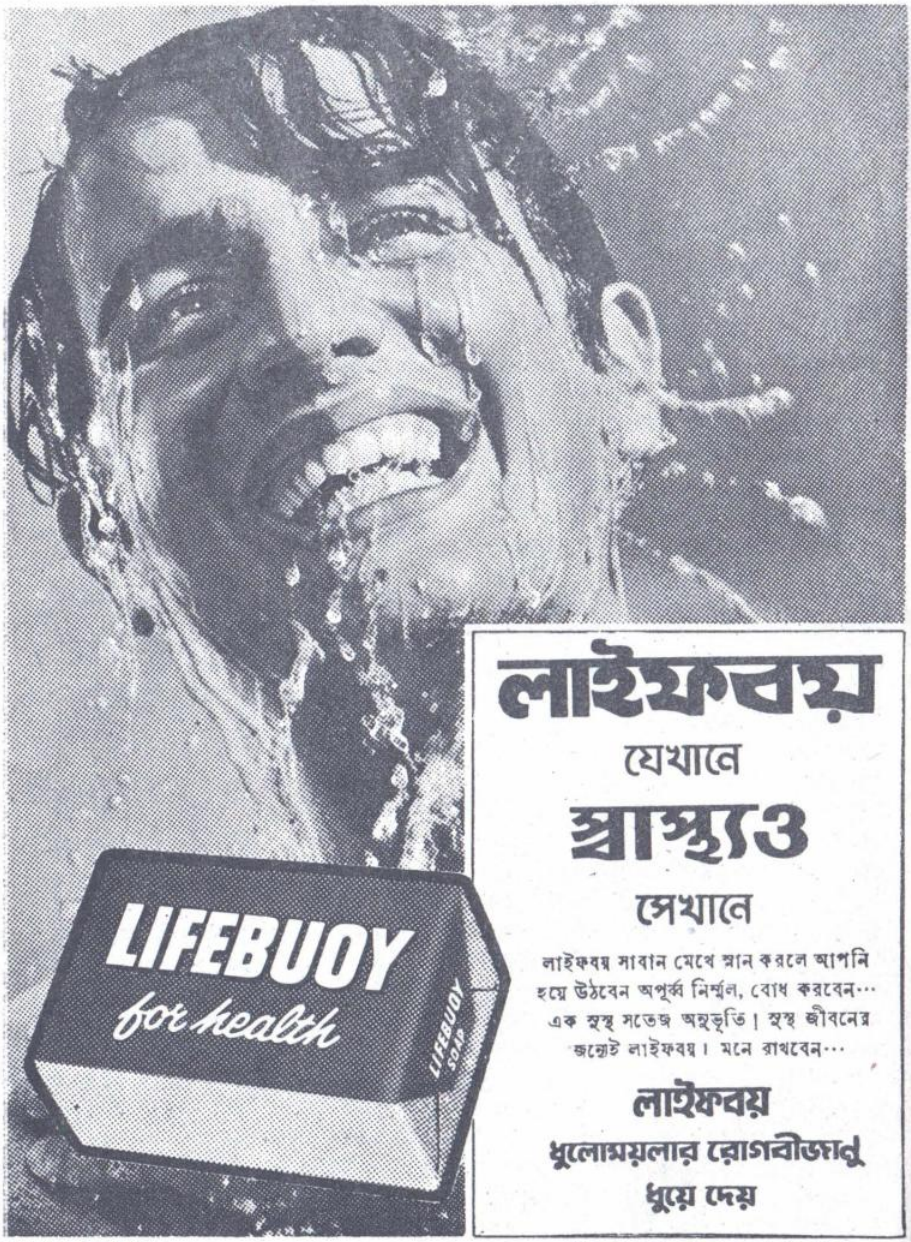

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন··· এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি। সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন···

লাইফবয়

ধুলোময়লার রোগবীজাণু

ধুয়ে দেয়

লিনটাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ওদের আনন্দটা তো আর নকল নয়।"

তো সেই রবিবারেই ঠিক হল। উপযুক্ত উত্তেজনা ও জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ওরা নয়জন আর বেক্সি রওনা হল চিন্টুর বাবার সঙ্গে। সন্ধেবেলা নিয়ে আসবেন বুয়ার বাবা। সব মা-বাবারাই তটস্থ কিন্তু ঝুমিরা কিছুতেই কোনো মাকে সঙ্গে আসতে দেয়নি। উপহার হিসেবে কোনো খাবার জিনিসও সঙ্গে দিতে দেয়নি। তবে খুব সাজগোজ করে নিয়েছে। চায়ে ডেকেছেন দাদু, তার একটা দায়িত্ব আছে তো?—ভাল কথা, বেক্সি চিন্টুর অ্যালসেশিয়ান, ওরই বয়সি, একেবারে গুড গার্ল।

দোতলার ছাতে বসে পিকি-দাদু পড়ন্ত রোদ পোয়াচ্ছিলেন। হৈ-হাই করে নেমে এলেন। চিন্টুর বাবা ওদের লক্ষ্মী হয়ে থাকতে বলে, দাদুকে নমস্কার করে চলে গেলেন। ওরা অধীর আগ্রহে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে উঠল দাদুর আস্তানায়। মিমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "দিদি, এইবার আমাদের চায়ে ডাকা হবে?" বেক্সি বেচারা নতুন জায়গাতেও কিছু না শুঁকে - টুঁকে ল্যাজটা আরো নামিয়ে খুটুর-খুটুর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠল।

উঠে কিন্তু ঝুমিরা একটু দমেই গিয়েছিল। একটাই ঘর, বেশ বড়ই, কিন্তু বই-পত্তরে ঠাসা। চৌকিটা, টেবিলটা, আলমারি দুটো, জানলার তাক, দেয়ালের ধার দিয়ে মেঝের উপরেও বই। চেয়ার দুটোই যা খালি। কী হবে? দাদুও বিভ্রাটটা বুঝেছিলেন, বললেন, "ভেবেছিলাম গুছিয়ে ফেলব, কিন্তু বঁটিতে পাঁউরুটি কাটতে গিয়ে—"

সত্যিই তো, দাদুর ডানহাতের তিনটে আঙুল জুড়ে জবর ব্যান্ডেজ। ঝুমি উদ্বিগ্নভাবে বলল, "নিরঞ্জনবাবুকে দেখিয়েছ তো?"

জাপু আর বুয়া বলে উঠল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরাই জায়গা-টায়গা করে খাবার-দাবার বের করে নেব।"

তিয়া, টুশি আর রিন্টা ঝাড়াঝুড়ি গোছগাছে লেগে গেল। দাদু একটা বাতিল সুজনি ঐ ব্যথা হাতেই কেটে চমৎকার কটা অ্যাপ্রন বানিয়ে দিলেন। জায়গা হল সামনের ছাতটায়। চেয়ার দুটো হল টেবিল। পাশে একটা বেঞ্চির উপরে একটা ধোপদুরস্ত ছেঁড়া চেক লুঙ্গি পাতা, প্লেট-টেট থাকবে। সাত-আটটা রকমারি মোড়া, দুটো ডেক চেয়ার, দাদুর জন্যে বেতের চেয়ারটা। দারুণ দেখাচ্ছিল। দাদুর ডিরেকশান-মতন বেরোল ড্রাগনের থাবাঅলা ঢাউস এক টী-সেট! আটটা পেয়ালা সমেত। ফ্যান্টাস্টিক! চারটে অন্য প্যাটার্নের পেয়ালা। তের-চোদ্দটা ছোট বড় প্লেট। ভারী রুপোর চামচ দুটো। কিন্তু ঐ সাতপুরু ধুলো তো ধুতে হবে? —মাকড়সাগুলোকে নয় রাজু আর চিন্টু বীরের মতন তাড়িয়ে দিল। দেখা গেল সাবান পড়ে আছে দাড়ি কামানোর ব্লেডের মতন এক চিলতে। দাদু টাকা দিলেন, একতলাতেই নির্মলের দোকান, সাবান এল।

কিন্তু চা কই? গ্যাসেরও চিহ্ন নেই। দাদু কেরোসিন স্টোভ জ্বালতে গেলেন, কেরোসিন নেই। বড় কেটলিটাও ফুটো। জ্যামের শিশিতে একটুখানি চিনি, অবশ্য এক টিন ভর্তি কন্‌ডেনসড মিল্ক। খাটা-খাটনি করে সকলেরই চন্‌চনে খিদে। কিন্তু ভাঁড়ারের কৌটো-বাটায় রয়েছে আড়াইটে বিস্কিট, দুই মুঠো মুড়ি আর খৈ, আর ইশবগুল! সবাই যখন মর্মাহত, ঠিক সেই মুহূর্তে জাপুর মাথায় প্যাম-প্যাম করে ব্রেনওয়েভ খেলে গেল, বলল, "দাদু, আজ আমরা কিনে খাব—খাবার, চা, সঅব। কেমন?"

তার পরের ঘটনা ঐতিহাসিক। বুয়ার মতে বোস্টনের টী পার্টির পরেই এইটা। সাবান কেনা ছাড়া নির্মলের দোকানে ওরা গিয়েছিল দু' বার, পাশের চায়ের দোকানে দু'বার, তেলেভাজার দোকানে একবার, ওপারে মিষ্টির দোকানে চারবার, তার পাশে ভুজাওয়ালার কাছে তিনবার (একবার শুধু ঝালনুন), আর আইসক্রীমওয়ালা তো সন্ধে পর্যন্ত দাদুর বাড়ির সামনেই বসে ছিল—গাড়ি বাজাচ্ছিল।

বেক্সিও অসম্ভব খুশি, দাদু ওকে সেন্ট বার্নার্ড কুকুরদের গল্প বলেছিলেন। আসবার সময়ে দাদু সক্কলকে আদর করে বললেন, "তোদের একটু হাতে-পায়ে ব্যথা হবে, কিন্তু আমরা তো গরিব দেশের লোক, হয় কষ্ট করতে হবে, নয়তো কসট্ বাড়বেই!"

ছবি অনুপ রায়

পরীক্ষার ফল / নির্ভর করে ভাল পুস্তক নির্বাচনের উপর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

By 7 Teachers

১ মাধ্যমিক প্রাণবিজ্ঞান সহায়িকা
২ মাধ্যমিক জড়বিজ্ঞান সহায়িকা
৩ মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
৪ মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
৫ মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
৬ HELPS TO THE STUDY OF SECONDARY ENGLISH

উপরোক্ত Help Book গুলি :

BASED ON GUIDE LINE PUBLISHED IN "পর্ষদবার্তা" BY THE WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (MONTHLY BASIS)

❶ বইগুলিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের "পর্ষদ বার্তা" (GUIDE LINE) পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে অনুসরণ করে, অর্থাৎ (a) OBJECTIVE TYPE, (b) ESSAY TYPE, (c) SHORT ANSWER TYPE, (d) ORAL TEST এই চারিপ্রকার QUESTIONS যথাযথভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

❷ প্রথমেই বলতে হয় বইগুলি প্রচুর চিত্রসমৃদ্ধ, তাই একাধারে "TEXT BOOK" ও "HELP BOOK"—সে জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হবে।

❸ মাধ্যমিক শিক্ষকগণ নতুন SYLLABUS অনুসরণ করতে গিয়ে এবং CLASS -এ পড়াতে গিয়ে যে যে অসুবিধার মধ্যে পড়েন সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

❹ নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসভুক্ত সমস্ত বিষয় (SUBJECT) বিশদভাবে অন্তর্ভুক্ত।

❺ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

❻ উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ।

❼ অধ্যায় শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর-নির্দেশ, ADDITIONAL QUESTIONS & HINTS দেওয়া হয়েছে।

ALLIED BOOK AGENCY

18A, SHYAMA CHARAN DEY STREET, CALCUTTA-700 073

Ever's 281

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" অচেনা লোক কাকাতুয়া কিনতে চায়। সাধু এসে পাখির উপর হামলা করে। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহ-শিক্ষক আহত, তার জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছে। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, সে জর্দা-পান খায়। যুধিষ্ঠিরও খায়। শীতের রাত্তিরে উদ্ধবের ঘরে কে ফ্যান চালাল? সার্কাসে যে মুখোশ-পরা লোক রোমহর্ষক খেলা দেখায়, গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। তারপর...

॥ ১ ॥

সকালবেলায় সার্কাসের খেলোয়াড়রা ট্রেনারের নির্দেশে কসরত করছিল। আসল যে-সব খেলা তারা দেখায়, তার চেয়েও এই কসরত বেশি কঠিন।

কসরতের সময় ট্রাপিজের জন্য নীচে জাল টাঙানো হয়েছে। জালের ওপর অনেক উঁচুতে, শূন্যে ট্রাপিজ-শিল্পীরা দোল খাচ্ছে। জালের নীচে চলছে সাইকেল, বীম ব্যালানস ইত্যাদি। এক ধারে শক্ত করে দুটো খুঁটিতে বাঁধা তারের ওপর চলছে শীর্ষাসন, এক-চাকার সাইকেলে একজনকে কাঁধে নিয়ে আর-একজন এপার-ওপার হচ্ছে আগু-পিছু করে। জোকাররা নানারকম ডিগবাজির ভেলকি লাগাচ্ছে এরেনার অন্য ধারে। দামি সীটের একটা চেয়ারে বিমর্ষ মুখে বসে দেখছে সামন্ত। পুলিস পিছনে লেগেছে, এখানকার ডেরাডান্ডা শিগগিরই তুলতে হবে। কিন্তু তুললেই যে রেহাই মিলবে এমন নয়। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হওয়ার পর কিছুদিন পুলিসের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। গোবিন্দকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ঝামেলা মিটেছিল বটে, কিন্তু গোবিন্দর শোকে সামন্তর আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরেছে, সেই সঙ্গে ঝামেলাও। মেরে ফেললেও অবশ্য সার্কাসের কেউই পুলিসের কাছে স্বীকার করবে না যে, গোবিন্দ এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাতে আর কতটুকু কী ভাল হবে? ভেবে-ভেবে সামন্তর মাথা গরম, মন উচাটন।

একটা উটকো লোক হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকে পড়ায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। সামন্ত চোখ তুলে দেখে, একটা পাগল। গায়ে আল-পাকার কোট, গালে দাড়ি, ময়লা পাতলুন। লম্বা-লম্বা চুলে জট পড়েছে। বেঁটে জোকার বক্রেশ্বর রে-রে করে তেড়ে গেল তার দিকে। লোকটা বক্রেশ্বরকে লক্ষই করল না। চারদিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "ছোঃ, এইসব খেলা দেখিয়ে লোক ঠকাও নাকি তোমরা?"

বক্রেশ্বর যখন খেলা দেখায় তখন তার হাতে একটা চুষিকাঠি থাকে। সেইটেই সে লাঠির মতো ব্যবহার করে। এখনো সেইটে বাগিয়ে ধরে বলল, "দেব নাকি কয়েক ঘা?"

লোকটা বক্রেশ্বরকে ভাল করে দেখার জন্য কোটের পকেট থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগায়। ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, "তোমার চেয়ে ঢের বেঁটে লোক দেখেছি। অত কায়দা দেখিও না।"

বক্রেশ্বর বুক ফুলিয়ে বলে, "আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেঁটে মানুষ। নইলে আমাকে ঠাহর করতে তোমার দরবিন লাগল কেন হে?"

লোকটা হেসে বলে, "অ্যায়সা বেঁটে মানুষও আছে, যাকে দেখতে মাইক্রোসকোপ লাগে। যাও, যাও, মেলা বোকো না।"

বক্রেশ্বর চুষিকাঠিটা তুলে মারতে গেল। কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে থমকে গিয়ে খানিকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, "আরে! চেনা-চেনা লাগছে যে।"

"আমাকে সবাই চেনে। আমি হচ্ছি গবা পাগলা।"

"সাজা-পাগল? না হওয়া-পাগল?"

"আসল পাগল হে, আসল পাগল?"

"বেশি বোকো না, তোমার চেয়ে ঢের বেশি পাগল লোক আমি দেখেছি।"

"দেখেছ ? সত্যি ?"

"সেই-সব পাগলাকে দেখলেই বোঝা যায়, এই হচ্ছে খাঁটি পাগল। তাকে বলতে হয় না, আমি অমুক পাগলা বা তমুক পাগলা।"

গবা মুখ বিকৃত করে বলল, "এমন পাগলামি দেখাতে পারি যা দেখলে তোমার পিন্ডি চটকে যাবে। কিন্তু এখন কাজে আসা, পাগলামির সময় নেই। সামন্তমশাইকে দুটো কাজের কথা জিজ্ঞেস করে যাব। তিনি কোথায় ?"

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে লোকটাকে দেখে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "বলি ও ভাই পাগলা গবা! আর কতকাল পাগলা রবা ? গোল ছেড়ে কও আসল কথা! পা নেই তার পায়ে ব্যথা।"

লোকটা মুখ বেঁকিয়ে বলে, "ভূতের সর্দি সারে, রাবণ যদি রামকে মারে, ঈশ্বর যদি বক্র তবে, গবা পাগল কেন হবে ?"

বক্রেশ্বর আর গবার এই তকরারে কেউ মনোযোগ দিচ্ছিল না। যে যার কাজে ব্যস্ত। বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে আবার ফিক করে হেসে বলল, "চাঁদ-বদনখানা দাড়িগোঁফে বড়ই ঢাকা, তবু চেনা-চেনা ঠেকছে হে। গলার স্বরটা লুকোতে পারোনি। তা চেনা যখন দিতে চাও না, আমারই বা কী এমন দায় ঠেকেছে চিনবার। ওই হোথা সামন্ত-মশাই বসে আছেন। চলে যাও সিধে।"

হাত তুলে বক্রেশ্বর সামন্তকে দেখিয়ে দেয়।

গবা গিয়ে সামন্তর পাশের চেয়ারে বেশ জুত করে বসে বলে, "এবার ঠান্ডাটাও পড়েছে মশাই।"

সামন্ত লোকটাকে বিরক্তির চোখে দেখে বলে, "কী চাই ?"

গবা একটু অপমান বোধ করে বলে, "ভাল লোকদের একটা দোষ কী জানেন ? তারা পাগল-ছাগলদের পাত্তা দিতে চায় না। তারা ভাবে, পাগলগুলো সত্যিই পাগল। তা পাগলগুলো কি আর পাগল নয় ? তারা তো পাগলই। কিন্তু ভাল লোকগুলো তাদের ভাবে পাগল। ভাল লোকগুলো এমন পাগল না মশাই, কী বলব আপনাকে...হিঃ হিঃ...পাগলগুলো যদি ভাল লোক হত তাহলে দেখতে পেত, আসলে ভাল লোকগুলোই এমন পাগল যে, পাগলকেই কেবল পাগল ভাবে।"

সামন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝলাম, কিন্তু কথাটা কী ?"

"কথা কি একটা ? কথা অনেক।"

"সংক্ষেপে বলে ফেল।"

"বলছিলাম কী, এসব কি খেলা নাকি ? বিষ্টুপুরের ওরিয়েন্ট সার্কাস কী দেখাচ্ছে জানেন ?"

"কী দেখাচ্ছে ?"

"ট্রাপিজ-ফ্যাপিজ নেই। স্রেফ শূন্যে কিছু লোক উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি তারের খেলা দেখাচ্ছেন, তারা দেখাচ্ছে বেতারের খেলা। এ-খুঁটো থেকে ও-খুঁটো কেবল একটা বাতাসের দড়ি টাঙানো, তারই ওপর দিয়ে লোকে সাইকেল চালাচ্ছে, হেঁটমুন্ডু হয়ে কসরত করছে। তাছাড়া আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আপনাদের বামনবীর মাত্র আড়াই ফুট লম্বা, আর ওরা কী দিয়েছে জানেন ? ওরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আমাদের বামনবীর মাত্র তিন ফুট বেঁটে।"

"তাই নাকি ?"

"আলবত তাই। লম্বাই যদি হবে, তবে আর বেঁটে বলবেন কী করে ? বলতে হলে এরকমই বলতে হয়, আমাদের বামনবীর তিন ফুট বেঁটে বা চার ফুট বেঁটে বা পাঁচ ফুট বেঁটে বা ছয় ফুট বেঁটে বা—"

"থাক থাক। আর বলতে হবে না।"

"বুঝেছেন তো ?"

"বুঝেছি।"

"কী বুঝলেন ?"

"বুঝলাম তুমি খাঁটি পাগল।"

গবা মাথা নেড়ে বলে, "ভাল মানুষদের তো ঐ একটাই দোষ। তারা পাগলকে ভাবে পাগল। পাগলরা যে সত্যিই পাগল তা কি পাগলরা জানে না ? আর তারা যে পাগল সেইটে বোঝানোর জন্য কোনো পাগল কি পাগল ছাড়া অন্য কোনো পাগলের কাছে যায় ? বলুন !"

সামন্ত জ্বালাতন হয়ে বলে, "তাও বুঝলাম। কিন্তু বাপু হে, আজ আমার মনটা ভাল নেই।"

"মন ভাল করার ওষুধ আমি জানি।"

"বটে! কী ওষুধ ?"

"একদম পাগল হয়ে যান। ভাল মানুষরা

যদি পাগল না হয়, তাহলে পাগলরা যে পাগল তা বুঝবে কী করে? আর একবার যদি পাগল হয়ে পাগলামির মজা টের পায়, তবে কি আর মন খারাপ থাকে?"

"ওঃ!" বলে সামন্ত নিজের মাথা চেপে ধরল।

গবা বলল, "এই কথাটাই বলতে আসা মশাই। তবে যাওয়ার আগে দু চারটে আজে-বাজে কথাও বলে যাই। কথাটা হল, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পেঁছেছে। রাত্রে স্পাই আসবে। রামু নামে একটা ছেলে আসতে পারে, খেয়াল রাখবেন।"

বলে গবা উঠে পড়ল।

সামন্ত মুখ তুলে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

গবা এরেনাটা পার হওয়ার সময় তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে খেলোয়াড়দের কসরত দেখে বক্রেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, "আড়াই ফুট লম্বা! হুঁ, লম্বাই যদি হলে তবে বেঁটে বলে অত বড়াই কেন?"

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে বলে, "তুমিও যেমন পাগল আমিও তেমনি লম্বা।"

গবা আর কথা বাড়ায় না। বেরিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে।

রবিবার বলে আজ একটু বেলায় বাজার করে হরিহরবাবু আর গদাধরবাবু ফিরছিলেন। গবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

গদাধরবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "এই যে বৈজ্ঞানিক গবা, তোমার সারানো ঘড়িটা অদ্ভুত চলছে হে। একেবারে ঘন্টায় মিনিটে সেকেন্ডে।"

হরিহরবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন,"তবে উল্টোদিকে।"

গদাধরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখুন হরিহরবাবু—"

হরিহরবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে বললেন. "কী বলবেন তা জানি গদাধরবাবু। তবে বলে লাভ নেই. গবা বিজ্ঞানের ব-ও জানে না। ও গবা, বলো তো, কাইনেটিক এনারজি কাকে বলে!"

গবা একটা প্রকান্ড হাই তুলে বলে, "আপনিই তো বলে দিলেন!"

"তার মানে?"

"কাইনেটিক এনারজিকেই কাইনেটিক এনারজি বলে। খুব সোজা কথা।"

হরিবাবু একগাল হেসে বলেন, "দেখলেন তো গদাধরবাবু, গবা কাইনেটিক এনারজি কাকে বলে জানে না।"

গদাধরবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কে বলল জানে না? এই তো বলল শুনলেন না? কাইনেটিক এনারজিকেই কাইনেটিক এনারজি বলে!"

দুজনের মধ্যে আবার একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল।

কিন্তু গবার সময় নেই। সে দ্রুত পায়ে চলেছে শহরের আর এক প্রান্তে। একটা খড়ের গাদায়। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

ষ্টোভ থেকে আরো বেশী রান্না পাবার উপায়।

এখানে দেওয়া তথ্যগুলি আপনার পক্ষে খুবই জরুরী। আজ থেকেই উপায়গুলি কাজে লাগাতে সুরু করুন, এর সুফলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। রান্নার জ্বালানী প্রতিমাসে আরো বেশী দিন যাবে।

৮ টী বিচক্ষন উপায় আপনার গ্যাস অথবা কেরোসিন বেশী দিন যায়

1 প্রথমে রান্নার সবকিছু গুছিয়ে নিন...
রান্না অনেক কম খরচের এবং সহজ হয় যদি ষ্টোভ জ্বালাবার আগে সবকিছু কেটেকুটে তৈরী করে রাখা থাকে এবং মশলাপাতিও আপনার হাতের কাছেই থাকে। অনাবশ্যকভাবে কখনও ষ্টোভ জ্বালিয়ে রাখবেন না।

2 উত্তাপের অপচয় বন্ধ করুন।
রান্নার পাত্র ঢাকা থাকলে ভেতরের তাপ ধরা থাকে, ফলে তাড়াতাড়ি রান্না হয় এবং 15% কম জ্বালানী পোড়ে। রান্না একবার ফুটতে আরম্ভ করলে অল্প আঁচই সহজে তা ফুটন্ত রাখতে পারে, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আঁচ কমিয়ে দিন। গবেষণায় দেখা গেছে এতে আপনার 35% জ্বালানীর সাশ্রয় হয়!

3 সঠিক পরিমাণ জল দিন।
অতিরিক্ত জলের জন্য, বিশেষতঃ চাল ও শাক-সব্জীতে, বেশী জ্বালানী খরচ হয়। সুতরাং জলের পরিমাণ যতোটা সম্ভব কম রাখুন; তাতে খাবার শুধু সুস্বাদুই নয়, আরো পুষ্টিকরও হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রান্না করার আগের রাত্রে ডাল ভিজিয়ে রাখলে তা রাঁধতে 35% কম জ্বালানীর প্রয়োজন হয়।

4 চওড়া নীচু পাত্র ব্যবহার করুন।
অন্ততঃ 25 সে.মি. ব্যাসের পাত্রই রান্নার জন্য আদর্শ, কারণ তা সম্পূর্ণ আঁচ গ্রহণ করে। অপ্রশস্ত পাত্রে জ্বালানীর অপচয় হয় (বিশেষতঃ যদি আঁচ পাত্রের পাশে লাগে) কারণ ভেতরের সামগ্রী রান্না হবার আগে পাত্রই প্রথমে উত্তাপ গ্রহণ করে। প্রয়োজনের চেয়ে উঁচু পাত্র ব্যবহার না করাই উচিত।

5 সকলে একসঙ্গে খেলেও অর্থের সাশ্রয় হয়।
পরিবারের সকলের একসঙ্গে বসে খাবার সময় স্থির করুন—এর ফলে খাবার বারবার গরম করতে হবেনা। তাতে জ্বালানীর সাশ্রয় হবে আবার খাবারের পুষ্টিও বজায় থাকবে।

6 প্রেশার কুকারে জ্বালানীর সাশ্রয় সবথেকে বেশী।
প্রেশার কুকারে রান্নায় সময় কম লাগে এবং সাধারণভাবে রান্না করার চেয়ে 30% কম জ্বালানী খরচ হয়। কিন্তু আপনি কি জানতেন যে আঁচ কমিয়ে দিলে, এমনকি ষ্টোভ নিভিয়ে দিলেও ভেতরের বাষ্পের চাপেই রান্না হতে থাকে? এর ফলে পাঁচ থেকে আট মিনিটের মতো জ্বালানী বাঁচানো যায়। আর একটা দারুণ সুবিধে: কুকারের বিভিন্ন বাটিতে চাল, ডাল, সব্জী—সব একসঙ্গে চাপিয়ে রান্না করে নেওয়া যায়। এর ফলে জ্বালানীর সাশ্রয়ের কথাটা একবার কল্পনা করুন!

7 ছোট বার্নার বেশী ব্যবহার করুন।
বড়ো বার্নারে সময় কম লাগে ঠিকই কিন্তু ছোট বার্নারের চেয়ে 10% বেশী জ্বালানী পোড়ে। প্রশ্ন করুন, যে সময়টুকু বাঁচালেন তা অতিরিক্ত জ্বালানী খরচের চেয়ে কি বেশী কাম্য? ছোট বার্নার ব্যবহারে প্রত্যেকবার জ্বালানী বাঁচে

8 পরিষ্কার বার্নারও সাহায্য করে।
আপনার বার্নার কি রুদ্ধ হয়ে গেছে, অথবা ষ্টোভের ফিতে কি পাল্টানো দরকার? ভালো আঁচের জন্য ষ্টোভ নিয়মিত পরিষ্কার করুন।

সর্বসাধারণের স্বার্থে পি সি আর এ কর্তৃক প্রচারিত।

এখানকার সমস্ত তথ্যই পি সি আর এ'র গবেষণা এবং পরীক্ষার ফলাফল। পি সি আর এ হ'লো ভারত সরকারের তৈল মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক কর্মসূচী। বিশ্বব্যাপী যে তৈল-সঙ্কটের প্রভাব আজ আমাদের সকলকে স্পর্শ করেছে, সাড়ে চার বছর আগেই তার পরিণাম অনুমান করে এটি আরম্ভ হয়েছিলো জ্বালানীর আরো উপযোগী, আরো লাভজনক ব্যবহার শেখানোর জন্য –বাড়ীতে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, রাস্তাঘাটে সর্বত্র। কারণ যতদিন না শক্তির কোনো বিকল্প উৎসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পৃথিবীর এই ক্রমহ্রাসমান তৈল-সম্পদের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার আমাদের করতেই হবে।

P C R A

PETROLEUM CONSERVATION RESEARCH ASSOCIATION
709-711, Surya Kiran Building
19 Kasturba Gandhi Marg New Delhi-110001

কারণ তেলের সঞ্চয় চিরদিন থাকবে না!

জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য কেটে রাখুন

তেল সংকট—আপনারও দুশ্চিন্তার কারণ।

এইসব উপায় অবলম্বন ক'রে আপনার জ্বালানী খরচের যথেষ্ট সাশ্রয় করতে পারেন। আমাদের এই অভিযান আরো পরিব্যাপ্ত করার কাজে, আপনার যেকোনো অভিমত আমাদের খুবই সহায়ক হবে। যে কোনো তথ্যের জন্য, আপনার মোটরযান এবং বাড়ীতে ব্যবহৃত জ্বালানীর উল্লেখ ক'রে, আমাদের লিখুন। আমরা বিভিন্ন গ্রাহকদলের জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারি—যেখানে থাকবে, বিশেষজ্ঞ দ্বারা বক্তৃতা, ফিল্ম প্রদর্শনী এবং সচিত্র পুস্তিকা বিতরণের বন্দোবস্ত। আপনি যদি ইচ্ছুক হন্, তাহ'লে কি ধরণের ব্যক্তি এবং কত সংখ্যায় এই বৈঠকে যোগ দেবেন, তার বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

দি প্রজেক্ট ম্যানেজার,
পেট্রোলিয়াম কনজার্ভেশন অ্যাসোশিয়েশন।

HTD-PCR-6699

তিন কোটিরও বেশী বাড়ীতে পৌঁছাতে হবে এই প্রচারের।
আপনার পাশের বাড়ীতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনারই।

বেলা তখন তিন প্রহর…
দাঁড়াও!—বেলা পড়ে এসেছে। আজ রাতটা দুর্গ ঘিরে এখানেই অপেক্ষা করব। সাবধান, কাছে যেয়ো না। গুলি ছুঁড়তে পারে।

এখানেই ছাউনি গাড়ো!

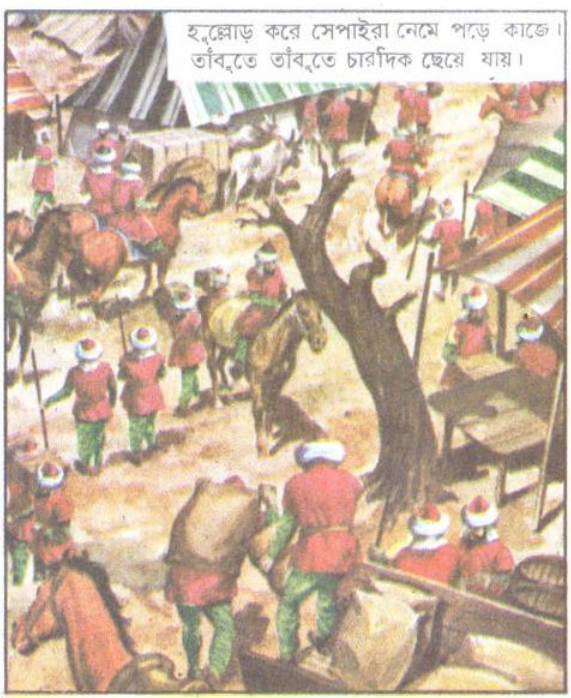

হুল্লোড় করে সেপাইরা নেমে পড়ে কাজে। তাঁবুতে তাঁবুতে চারদিক ছেয়ে যায়।

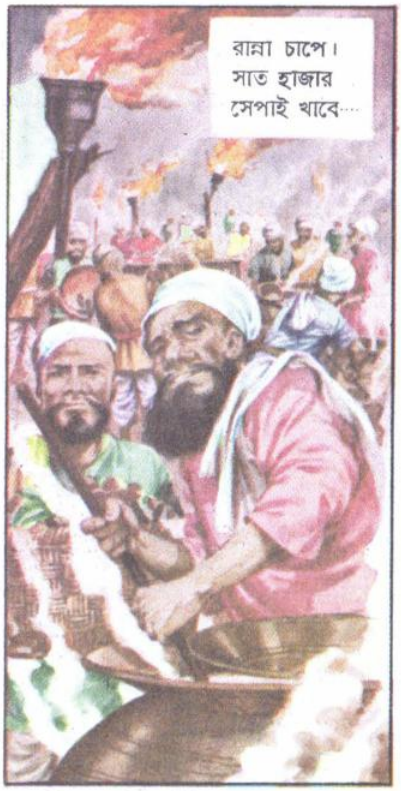

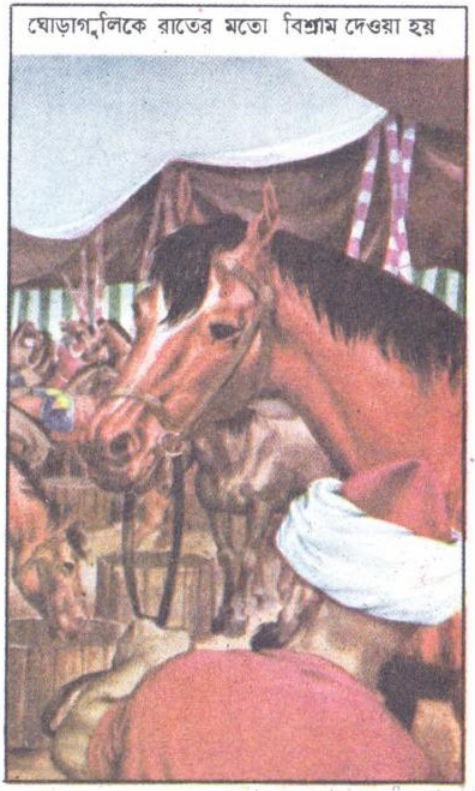

ওদিকে, সেনাপতি
লিয়াকত খাঁ-র শিবিরে

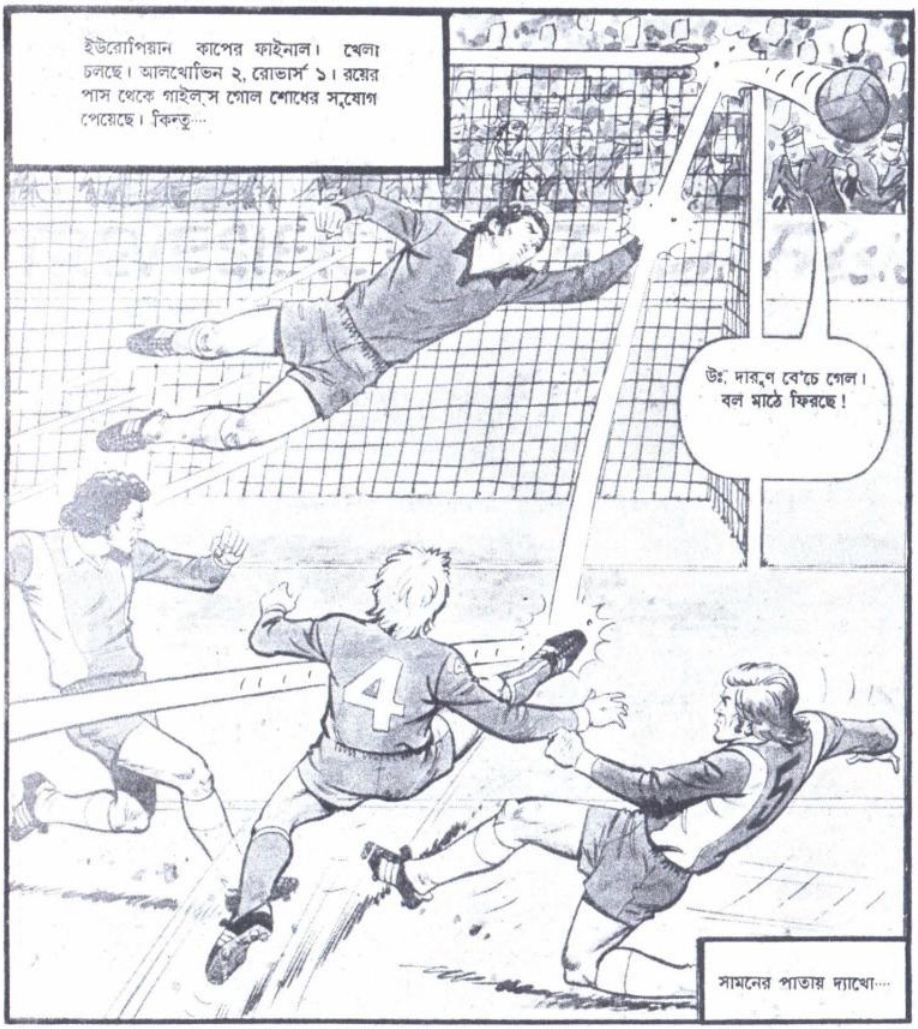

রোভার্সের রয়
ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনাল। খেলা চলছে। আলখোভিন ২, রোভার্স ১। রয়ের পাস থেকে গাইল্‌স গোল শোধের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু····
উঃ, দারুণ বেঁচে গেল। বল মাঠে ফিরছে!
সামনের পাতায় দ্যাখো····

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দুম!
ব্যাপারটা দেখছি ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়াচ্ছে!
যা বলেছ!
শুধু কি তাই?
প্রথমে তো গাড়ি দুম-ফট, তারপর আমার লাইটারও!
তবে কি পেট্রোল
নিশ্চয়ই পেট্রোলে কিছু মেশানো ছিল! কিন্তু কে মেশাল? নিশ্চয়ই তারা, গাড়ি খারাপ হওয়ায় যাদের লাভ আছে। তারা কারা?
গাড়ি যারা মেরামত করে, তারা। গাড়ি সারাইয়ের সবচেয়ে বড় কোম্পানি হল অটোকার্ট!
!
সুতরাং অটোকার্টই পেট্রোলে কিছু মেশাবার ষড়যন্ত্র করেছে। এত যে গাড়ি দুম-ফট হচ্ছে, অটোকার্টই এর মূলে!
সেটা সম্ভব, কিন্তু
আবার কিন্তু কিসের? সাক্ষ্যপ্রমাণ, জোগাড় করে দিন-সাতেকের মধ্যেই ওদের গ্রেফতার করব।
আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক।
চলো, অটোকার্ট কারখানায় যাওয়া যাক।
ভিতরে ঢুকব?
মেরামতির কাজ জানা দক্ষ কয়েকজন ড্রাইভার চাই কর্মখালি
কর্মখালি
ড্রাইভার সেজে ঢুকে পড়লে কেমন হয়?
ঠিক বলেছ!
পরদিন
কী করতে হবে, বুঝে নিয়েছ?
নিশ্চয়।
ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে কিন্তু সেটা কী?
?
আবার অ্যাডভেঞ্চারের শখ জেগেছে বুঝি?
সত্যি, তোমার আর শিক্ষা হবে না!

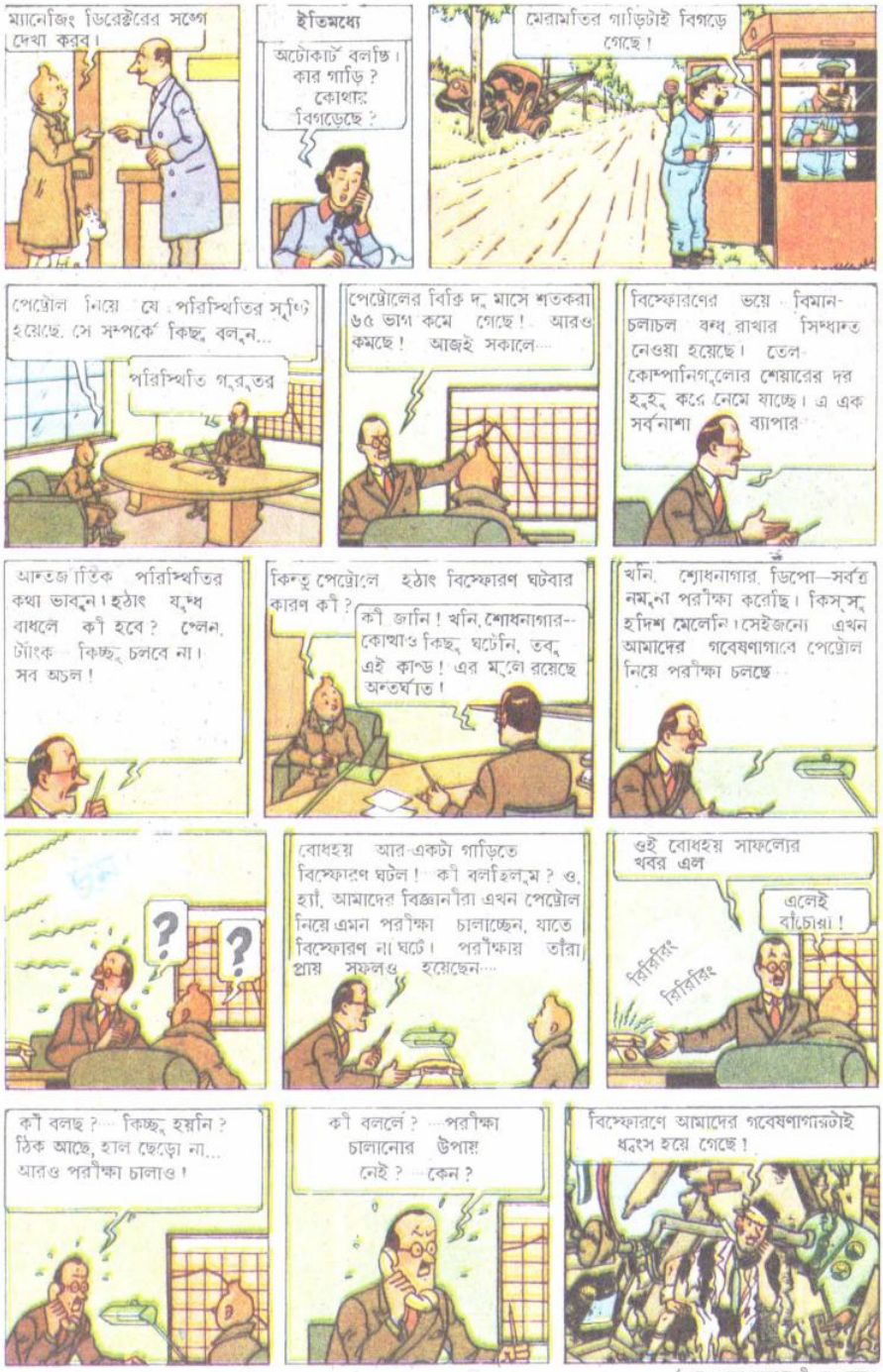

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

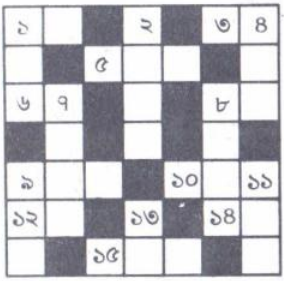

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ময়ূর। (৩) আকাশের একটি তারা। (৫) বিস্ফোরক দ্রব্য। (৬) ধাতু-বিশেষ। (৮) ঝাঁজালো শস্য। (৯) একজাতীয় পাখির সঙ্গে কোন্ জন্তুর মিল ঘটিয়ে সুকুমার রায় এক আজব জীব সৃষ্টি করেছিলেন? (১০) যা-যা আকাশে ওড়ে তার মধ্যে একটি। (১২) সংগীতের সুর। (১৪) খরচের উলটো। (১৫) সমুদ্রস্নানে যারা ভরসা।

উপর-নীচ : (১) কোন্ পা মাথায় থাকে? (২) যেখানে গাছপালা জন্মায় না। (৪) গর্ব। (৭) পথের ডাকাত। (৮) লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। (৯) দ্বিগু সমাসের একটি উদাহরণ। (১১) শেষ। (১৩) এক হাতে যা বাজে না।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ধাঁধা

কয়েকদিন ধরেই ছেলে তিনটিকে দেখছি, ছোট্‌কার কাছে আসে, কিছুক্ষণ গল্প করে, তারপর চলে যায়। মুখগুলো চেনা। আমাদের পাড়া থেকে খুব বেশি দূরে থাকে না। ছোট্‌কার কাছে আগে অবশ্য কোনোদিন আসতে দেখিনি। হঠাৎই একদিন এল। তারপর থেকে প্রায়ই আসে।

ব্যাপারটা জানলাম সরস্বতী-পুজোর দিন। ছোট্‌কা ফিরল বেলা করে। দুপুরের খাওয়া সেরে ছোট্‌কার ঘরে গিয়ে দেখি, ইজি-চেয়ারে সে আধশোয়া, তিন-চারখানা কাগজ টেবিলের ওপর, একইরকম চেহারা, ওই কাগজই একখানা আবার ছোট্‌কার হাতে। আমিও হাতে তুলে নিলাম একটা, খাটের কোণে গিয়ে বসলাম। খুব বড়সড়ো কাগজ কিছু নয়, সরস্বতীপুজোর স্যুভেনির, তবে ভেতরে বেশ নামী লেখকের কিছু লেখা রয়েছে। আরে ছোট্‌কারও একটা লেখা রয়েছে দেখছি। একটা ছোট্ট প্রবন্ধ।

"তুমি লিখেছ ছোট্‌কা?" প্রশ্ন করলাম, "কবে লিখলে এটা?"

ছোট্‌কা বলল, "লিখলাম শুধু! এর অর্ধেক লেখাই তো আমার যোগাড় করা। তবে বৃথা। বাচ্চাদের কান্ড! যা সব ছাপার ভুল, এ-কাগজ আর হাতে করে কাউকে দেওয়া যাবে না। এত উৎসাহ নিয়ে এল, এত কান্ড করে লেখা যোগাড় করা হল, শেষ পর্যন্ত এইভাবে ছাপা হল। কাল পবিত্ররা এলে বকুনি দেব।"

ছোট্‌কার কথা থেকে বুঝলাম, ওই ছেলে তিনটিই স্যুভেনিরের লেখার জন্য ছোট্‌কার কাছে আসা-যাওয়া করছিল এ-কদিন। আর তথ্য যা পেলাম, তা নিয়ে একটা ধাঁধা হয়ে যায়। সেটাই দিচ্ছি এবার।

প্রথম ধাঁধা : তিন বন্ধু। পবিত্র, গোপাল আর কল্যাণ। একজন বসু, একজন গুহ, একজন কর-মজুমদার। পদবীগুলো যথাক্রমে বলা হয়নি, এলোমেলোভাবে বলা।

স্যুভেনিরে কল্যাণের পদবী বসু ছাপা হয়েছে। ছাপার ভুলের এখান থেকেই শুরু।

পবিত্রর ঠাকুর্দা অমরেশ কর-মজুমদার প্রচুর স্কুলপাঠ্য বই লিখেছেন। ইতিহাস বই-ই দশটা। ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ভাগে ভাগে পড়ানো হয়।

পবিত্রর যখন ৬ বছর বয়েস, ঠাকুর্দার লেখা ইতিহাসের প্রথম ভাগ পাঠ্য ছিল। এখন ও পড়ছে ওই ইতিহাস বইয়েরই সপ্তম ভাগ।

পবিত্র বরাবরই পড়াশুনায় ভাল। কল্যাণ এক ক্লাসে পড়লেও বয়সে পবিত্রর থেকে এক বছরের বড়। বসু যার পদবী, পবিত্র তার থেকেও এক বছরের ছোট।

এ থেকে বলতে হবে প্রত্যেকের পুরো নাম ও পদবী এবং বয়েস। পারবে? বোধহয় পেরেও গেছ কেউ-কেউ, তাই না?

দ্বিতীয় ধাঁধা : জন্মদিনের উপহারের জন্য তিরিশ টাকা নিয়ে দোকানে গেছেন একজন। বই কিনলেন আর একটা সুন্দর ফাউন্টেনপেন। তিরিশ টাকা লাগল না বটে, কিন্তু কুড়ি টাকার বেশিই খরচ হল। ভদ্রলোক হিসেব করে দেখলেন যে, বইয়ের দাম যদি পাঁচ টাকা বেশি হত, পেনের দাম সেক্ষেত্রে হত মোট খরচের তিন ভাগের এক ভাগ। আর পেনের দাম পাঁচ টাকা কম হলে, সেক্ষেত্রে মোট খরচের চার ভাগের তিন ভাগই লাগত বইতে।

বইটা কত দামে কেনা?

তৃতীয় ধাঁধা : কোন্ বাচ্চা কাঁদে না?

গতবারের উত্তর : (১) পল্টুর বয়স ১৬, তাপসের ১০, গৌতমের ৭। (২) দুভাবে করা যায় উত্তর-- তিনটে কাঠি দিয়ে রোমান হরফে চার লেখা অথবা ইংরেজি সংখ্যায় চার লেখা। IV অথবা 4 (৩) গরুড়ধ্বজ, মানে বিষ্ণু। (৪) না (নাগাল)।

সভাসন্ধ

কিসের ফোটো

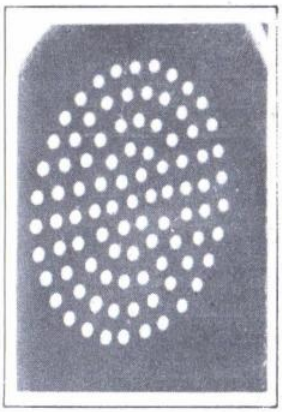

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল প্রজাপতির পাখার ফোটো ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ তোমার যে মনের রোগ হয়েছিল, নিজেকে সবসময় শাজাহান ভাবতে, সেটা এত-দিনে পরোপুরি সেরে গেছে, আমার বিলটা এবার মিটিয়ে দেবে তো?

উঃ দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, আগে টেলি-ফোনে সুখবরটা মমতাজকে জানিয়ে দিই।

প্রঃ কপালের লিখন খণ্ডায় না শুনি, লিখনটা পড়া যায় কী করে?

উঃ ভাল টাইপরাইটারে টাইপ করিয়ে নিও।

প্রঃ ঈশ্বর কোন গাড়িতে চড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাতায়াত করেন?

উঃ হরি-মোটর।

সুসেন

মজার খেলা

বন্ধুকে একটা সংখ্যা পছন্দ করতে বলো, তোমাকে জানাবে না। এবার সংখ্যাটাকে বলো প্রথমে ৫ দিয়ে গুণ করে ফেলতে। গুণফলকে ৮ দিয়ে গুণ করতে বলো। আবার সেই গুণফলকে বলো ৩ দিয়ে গুণ করে ফেলতে। লিখে লিখে করতে বলো, ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকবে।

যাই হোক সব-শেষে যে গুণফল হল, এবার সেই গুণফলকে বলো বন্ধুর পছন্দ-করা সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করে ফেলতে। ভাগফলের সঙ্গে আবার সেই পছন্দ-করা সংখ্যাটা যোগ দিতে বলো। এইবার বন্ধুকে বলো, সে যেন এই উত্তরটা তোমাকে জানায়।

উত্তর বলল বন্ধু। তুমি এবার কী করবে? তুমি এবার মনে মনে ৫×৮×৩ বা ১২০ বিয়োগ দিয়ে দাও বন্ধুর বলা শেষ উত্তর থেকে। ব্যস, তাহলেই দেখবে, যে-সংখ্যা থাকছে, সেটাই হবে বন্ধুর প্রথম পছন্দ-করা সংখ্যা।

উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে? বেশ। ধরো, বন্ধু পছন্দ করল ২৫। তাহলে বন্ধু কী করছে? প্রথমে ৫ দিয়ে গুণ, হল ১২৫। তারপর ৮ দিয়ে গুণ হল ১০০০। তারপর ৩ দিয়ে গুণ হল ৩০০০। এবার পছন্দ-করা সংখ্যা ২৫ দিয়ে ৩০০০কে ভাগ। হল—১২০। এবার এর সঙ্গে পছন্দ-করা সংখ্যা ২৫ যোগ। হল ১২০+২৫=১৪৫। সে এই ১৪৫ সংখ্যাটাই তোমায় জানাল। আর তুমি এর থেকে সঙ্গে সঙ্গে ১২০ বিয়োগ দিয়ে পেয়ে যাচ্ছ বন্ধুর পছন্দ-করা ২৫ সংখ্যাটি।

দুটো অঙ্ক দু-বার শেখানো হল। এ থেকে নিশ্চয়ই নিয়মটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তোমাদের কাছে। নিয়ম না-বলে রহস্য বলাই ভাল। তবে হ্যাঁ। রহস্যটা নিজেরা জেনে ফ্যালো, অন্যকে কিন্তু জানাবে না।

মজারু

হাসিখুশি

কোম্পানির ম্যানেজার চাকুরি-প্রার্থীকে বললেন, "আপনার ঠিকানাটা রেখে যান, যখন আমাদের একজন প্রবীণ কেরানীর দরকার পড়বে, আপনাকে জানাব।"

তরুণ চাকুরিপ্রার্থী অবাক হয়ে বললেন, "প্রবীণ কেরানী? বলেন কি মশায়? আমার তো বয়েস মাত্র চব্বিশ।"

ম্যানেজার বললেন, "তাতে কী? যতদিনে আপনাকে আমরা ডাকব ততদিনে আপনি প্রবীণ হয়ে যাবেন।"

সমুদ্র থেকে স্নান করে উঠে এসে এক ভদ্রলোক সামনে বসে থাকা এক মহিলার কাছে নালিশ জানালেন, "দেখুন, জলের ধারে জামা-জুতো রেখে গিয়েছিলাম আপনার ছেলে আমার জুতোটা ভিজিয়ে দিয়েছে।"

মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করলেন, "না, না, আমার ছেলে আপনার জুতো ভেজায়নি, জুতো ভিজিয়েছে তার বন্ধু, আমার ছেলে আপনার জামার পকেট থেকে মানি-ব্যাগ আর চশমাটা বার করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

আশ মিটিয়ে আকাশ-ছোঁয়া
মহল বানাবো···
সবদিকেতেই রঙবেরঙের
জেম্‌স লাগাবো !

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!

OBM,6065 BN

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

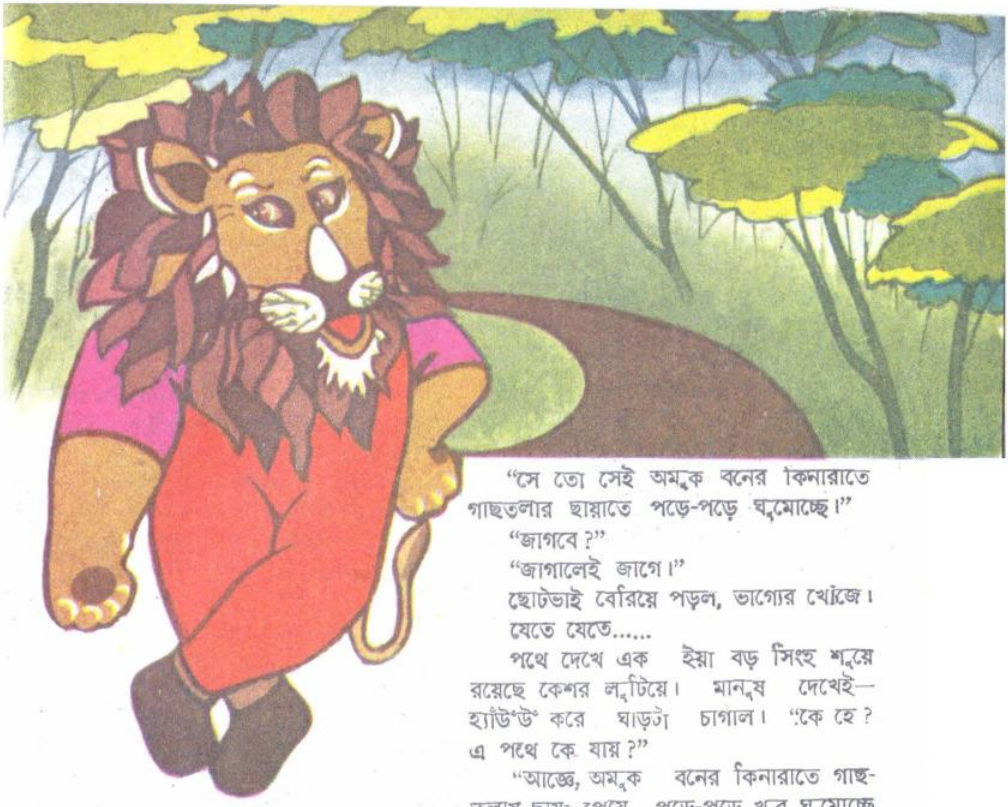

ভাগ্য

(আফ্রিদি উপকথা)

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরে ভাই, পয়লা চাই বরাত। কথায় বলে না, বরাত জোর তো সুযোগটাও তোর।

কেবল বরাত নয় রে দাদা, দুসরা চাই মগজ। বুদ্ধি যদি না থাকে বাপ, যতই সুযোগ পাও, ফলবে?

শোনো গল্প তা হলে।

দুই ভাই, তার বড় জন দিব্বি পয়মন্ত, আর ছোটটা হল তেমনি হতভাগা—যেমন দেখতে, লিখতেও তেমনি। তবু পাশটা-পাঁচটা দেখেশুনে মন ছটফট করে, ধরেছে বড়কে এসে একদিন। "হ্যাঁ দাদা, সবাই যে বলে তোমার ভাগ্যকে তুমি কাছ ছাড়াই হতে দাও না, আমার ভাগ্য তবে কোথায়?"

"সে তো সেই অমুক বনের কিনারাতে গাছতলার ছায়াতে পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে।"

"জাগবে?"

"জাগালেই জাগে।"

ছোটভাই বেরিয়ে পড়ল, ভাগ্যের খোঁজে। যেতে যেতে.....

পথে দেখে এক ইয়া বড় সিংহ শুয়ে রয়েছে কেশর লুটিয়ে। মানুষ দেখেই—হ্যাঁউঁউঁ করে ঘাড়টা চাগাল। "কে হে? এ পথে কে যায়?"

"আজ্ঞে, অমুক বনের কিনারাতে গাছ-তলায় ছায়া পেয়ে পড়ে-পড়ে খুব ঘুমোচ্ছে ভাগ্য। দেখি জাগে কি না।"

"তাই? তা জেনে এসো তো আমার এমন অসুখ করল কেন। আর সারবে বা কিসে।"

"খুব জেনে আসব।"

আবার কতক দূর যেতে, দেখে এক ঘোড়া শুয়ে রয়েছে ঘাড়মুড় গুঁজে।

"চেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হে হে হে—কে হে? এ-পথে কোথায়?"

"আজ্ঞে, অমুক বনের কিনারাতে গাছ-তলায় ছায়া পেয়ে পড়ে-পড়ে খুব ঘুমোচ্ছে ভাগ্য। দেখি জাগে কি না।"

"তাই? তা জেনে এসো তো বাপু, আমার এমন অসুখ করল কেন? আর সারবে বা কিসে?"

খুব জেনে আসব।

আবার কতক পথ যায়. দেখে এক হা-পাতা জো-পাতা মুড়ো গাছ।

শনশন-শনশন করে উঠল বাতাস আঁচড়ে। "কে হে? এ পথে কোন পথে?"

"আজ্ঞে অমুক কিনারাতে গাছতলায় ছায়া পেয়ে পড়ে-পড়ে খুব ঘুমোচ্ছে ভাগ্য। দেখি জাগে কি না।"

"তাই? তা জেনে এসে তো বাপু, আমার এমন অসুখ করল কেন? আর সারবে বা কিসে?

"খুব জেনে আসব।"

যেতে যেতে.....

হঠাৎ দেখে গাছপালা-ঝোপলতা-জড়ানো ঘোর বন, একেবারে মুখের ওপরে। ও বাবা! এই বন পেরোতে হবে নাকি?

হোক। আজ ছাড়াছুড়ি নেই, বলে, ঢুকেই পড়ল বনে, যা থাকে বরাতে।

আর, দশ কদম গেছে কি না গেছে, দেখে মস্ত একটা ঝাঁপা গাছের নীচে পুরু ফুল-পাতার জাজিমের ওপর দিব্বি ঘুমিয়ে আছে পরমা সুন্দরী একটা মেয়ে।

এই নাকি ভাগ্য? ঘুম দেওয়া হচ্ছে গাছের ঠান্ডাতে? আমি মরছি আনেবানে আর ঘুম দেওয়া হচ্ছে পড়ে-পড়ে? ঘুম? ভয়ানক রেগে সবলে ঝাঁকিয়ে তুলল গিয়ে ছোট। আমি মরছি খিদের ঝালে আর পড়ে-পড়ে ঘুম দেওয়া হচ্ছে! ঘুম?

চোখ ডলতে-ডলতে উঠে বসেছে ততক্ষণে মেয়ে।

"কী, রা নেই যে! এমনি কেন আমার হল? কেন?"

"কেন? সে তোমার মাথায় মগজ নেই বলে।"

"ও, আমার মগজ নেই! বেশ। না থাকল নেই। তা সিংহের অসুখ হল কেন? কিসে সারবে?"

"বোকা মানুষের মাংস খেতে পেলেই সিংহের রোগ সারে।"

"বেশ, তাই বলব গিয়ে। তা ঘোড়াটা ধুঁকছে কেন?"

"সাহসদার একটা সোয়ার পিঠে চড়ালেই ওর তেজ ফিরে আসবে।"

"আর গাছটা?"

"ওর গোড়াতে যে ঘড়া-ঘড়া আশরফি-মোহর। বাড়বে কোত্থেকে? কেউ তুলে দেয় তো আবার পাতা হবে।"

"বেশ, চললুম। খুব খাটনি খাটিয়েছ সারা দিন, দেখো, আর ঘুম না।"

ফেরার পথে প্রথমেই সেই গাছ। দেখেই শুকনো ডাল শন-শন শন-শন করে উঠল বাতাস আঁচড়ে। "জানতে পেলে কিছু?"

"তোমার গোড়াতে যে ঘড়া-ঘড়া আশরফিমোহর। তুলে ফেললেই ফের পাতা গজাবে।"

"তা তুমিই নাও না কেন তুলে।"

"আমি? আমি এখন মাটি ঘাঁটতে বসব? কলসি তুলব হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে? না বাপু, আমার ভাগ্য জেগে গেছে, আমায় এখুনি ঘরে ফিরতে হবে।"

কতক পথ ফিরে, দেখে সেই ঘোড়া তাকে দেখেই ছটফট করে উঠে বসল। "জানলে কিছু?"

"সাহসদার কাউকে পিঠে চড়ালেই তোমার তেজ ফিরে আসবে।"

"তা তুমিই চড়ো না কেন, এক দমে উড়িয়ে-ঘুরিয়ে আনি গজনি-কাবুল আমু নদী।

"না বাপু, অত লাফাঝাঁপা ভাল্লাগে না আমার। আর তা বাদে আমার ভাগ্য জেগে গেছে, আমায় এখুনি ঘরে ফিরতে হবে।"

বলতে-বলতে খুশি মনে ফিরে চলল ছোট ঘরের পথে। কতক দূর গেছে— হাঁউউউ— পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে সেই সিংহ। "কী, হল কিছু?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, জেগে গেছে ভাগ্য।"

"তা আমারটা কিছু জানতে পেলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, খোঁজো এখন থেকে। একটা বোকা মানুষের মাংস খেলেই অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

"ভাল হয়ে যাবে? তা আর কেউ কিছু জানতে বলেছিল তোমায়?"

"বলেছিল বই কী। এই তো ঘোড়ারটা ঘোড়াকে বলে এলাম, গাছেরটা গাছকে বলে এলাম।" বলে, যা বলেছে বলল।

"এখন তোমারটা তোমায় বলে...আর সময় নেই বাপু, আমার ভাগ্য জেগে, আমায় এখুনি ঘরে ফিরতে হবে।"

"অত তাড়া কী! এসে পৌঁছক ভাগ্য। দাঁড়াও।"

"এসে পৌঁছবে?"

"পৌঁছবে তো। এই দেখ না!"

বলে এক চাপড়ে মুন্ডুটা তার ছিঁড়ে ফেলল সিংহ।

ছবি রতন সেন

গুগলি

আমাদের একটা বিড়াল ছিল। বিড়ালটার নাম গুগলি। সে আমাদের বাড়িতে সকালবেলা ও দুপুরবেলা খাবার খেতে আসত। রাত্তিরবেলায় ঘরে ঢুকে ঘুমোত।

একদিন খুব বৃষ্টি নেমেছিল। দেখলাম, বেড়ালটা কেঁদে বেড়াচ্ছে। ওর চোখ লাল।

সবাই বলল সাপে কামড়েছে। বেড়ালটাকে তারপর থেকে আর দেখতে পাইনি। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। সেই থেকে আমি আর কোনো জীবজন্তু পুষি না।

টুপুর মুখোপাধ্যায় (বয়স ৭)

ভোম্বল সব বোঝে

হঠাৎ সোম ও মঙ্গলবার ছুটি পড়ে গেল। আমার তাতে খুব আনন্দ হল। আমার কুকুর ভোম্বল আমার সব কথা বোঝে। আমি সেই কথাটা ভোম্বলকে বললাম। তাতে ভৌ-উ-উ-উ, ভৌ-উ-উ-উ করে উঠল। ও বলতে চাইল, কী মজা!

প্রদীপ্ত বিশ্বাস (বয়স ৭)

সাতাশির আনন্দমেলা

সাতাশির আনন্দমেলা
পুজোসংখ্যা ভাই—
এক কথা বলছি তো
কোনো জবাব নাই।
মনোরম প্রচ্ছদপট
সুন্দর বাঁধাই,
ছেলেবুড়ো সবাই বলে
ওই বইটা চাই।

স্নিগ্ধ মজুমদার (বয়স ১৩)

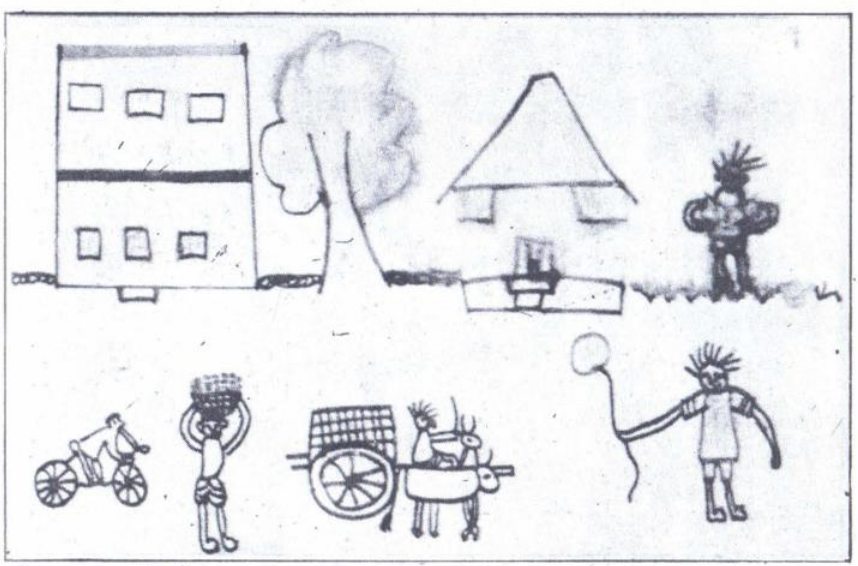

ছবি এঁকেছে **চৈতালি বসু** (বয়স ৯)

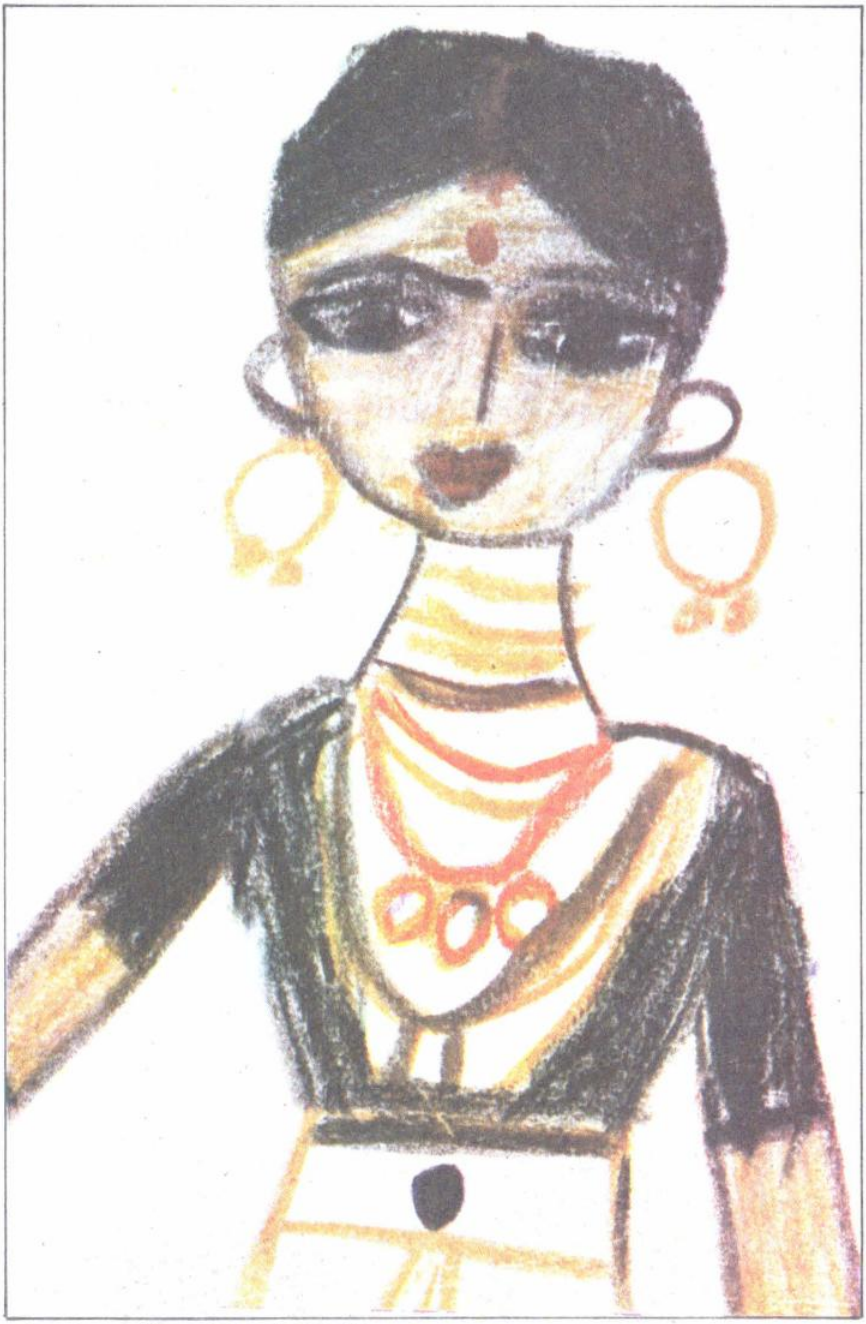

ছবি এঁকেছে জিষ্ণু সান্যাল (বয়স ৬)

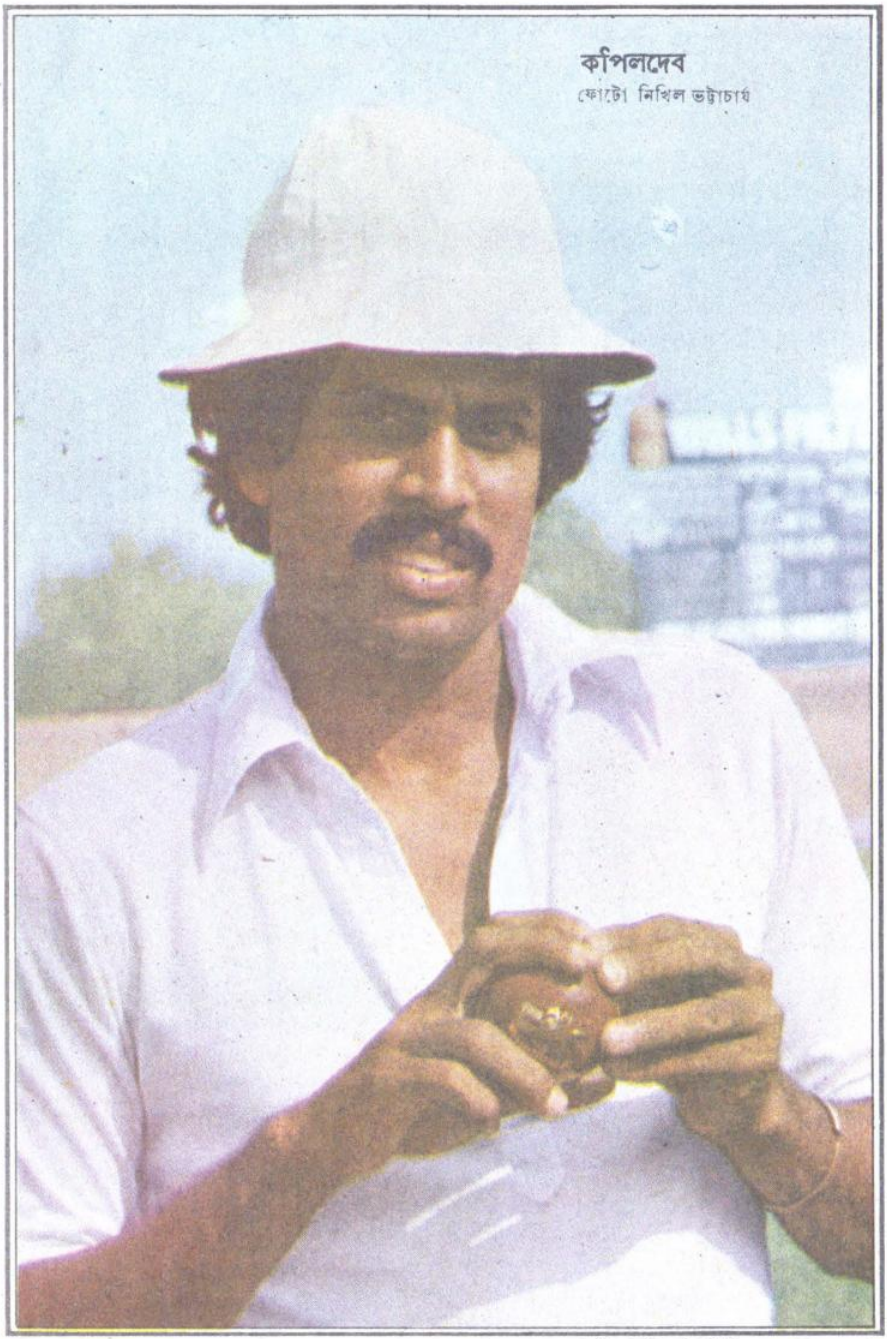

কপিলদেব
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

মেলবোর্নে জয়

অলোক দাশগুপ্ত

খবরটা পড়ে চমকে উঠেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল মন্তব্য করেছেন, ভারত টেস্ট খেলার যোগ্য নয়। "ওদের উচিত কানাডা বা শ্রীলংকার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা।"

আন্দাজ করতে পারি, গাভাসকার এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়দের কানে এই বাঁকা উক্তি গিয়ে পৌঁছেছিল, এবং আর-দশজন ভারতীয়র মতো তাঁরাও অপমানিত বোধ করেছিলেন। তারপর ঘটল সেই অপ্রিয় ঘটনাটি। ডেনিস লিলির অফ-কাটার গাভাসকারের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে প্যাডে লাগল। বোলার লিলি আউটের আবেদন জানাতেই আম্পায়ার ওয়াইটহেড আঙুল তুলতে দ্বিধা করলেন না। হতভম্ব গাভাসকার। দারুণ ব্যাট করছিলেন, আর মাত্র ৩০ রান করতে পারলে ২৪তম টেস্ট সেঞ্চুরিটি পেয়ে যেতেন। এই সময়ে বিপত্তি। আম্পায়ারকে বারবার দেখাতে লাগলেন বল আগে তাঁর ব্যাটে লেগেছে, তারপর প্যাডে। কিন্তু আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে-করতে গাভাসকারের দিকে তেড়ে এলেন লিলি ; আঙুল দিয়ে দেখালেন বল প্যাডের কোথায় লেগেছে। ভারতীয় অধিনায়কের মুখ তখন রাগে লাল টকটকে হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন নন-স্ট্রাইকার চৌহানের দিকে, এবং প্রায় টানতে টানতে চৌহানকে নিয়ে চললেন মাঠের বাইরে।

বিশ্বনাথ

ডেনিস লিলি দেখাচ্ছেন, তাঁর বল সুনীলের প্যাডের কোন্‌খানে লেগেছিল। কিন্তু তোমরা যারা টেলিভিশনে অ্যাকশন রিপ্লে দেখেছ, তারা জানো, বল আগে ব্যাটে লেগেছিল, তারপর প্যাডে। আম্পায়ার ওয়াইটহেডের ভুল-সিদ্ধান্তে সুনীল তাই স্বতই ক্ষুব্ধ হন।

সারা মাঠ চুপ। সবাই বিস্মিত। এ কী করছেন গাভাসকার? ভারত কি তবে প্রতিবাদে ম্যাচ ছেড়ে দেবে? ছুটে এলেন ম্যানেজার উইং কমান্ডার দুরানি ; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চৌহান এবং বেংসরকারকে মাঠে পাঠালেন। খেলা আবার শুরু হল।

এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ক্রিকেট-দলকে প্রায়ই আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতে হয়েছে, আর তাই বোধহয় গাভাসকার নিজের অসন্তোষ চেপে

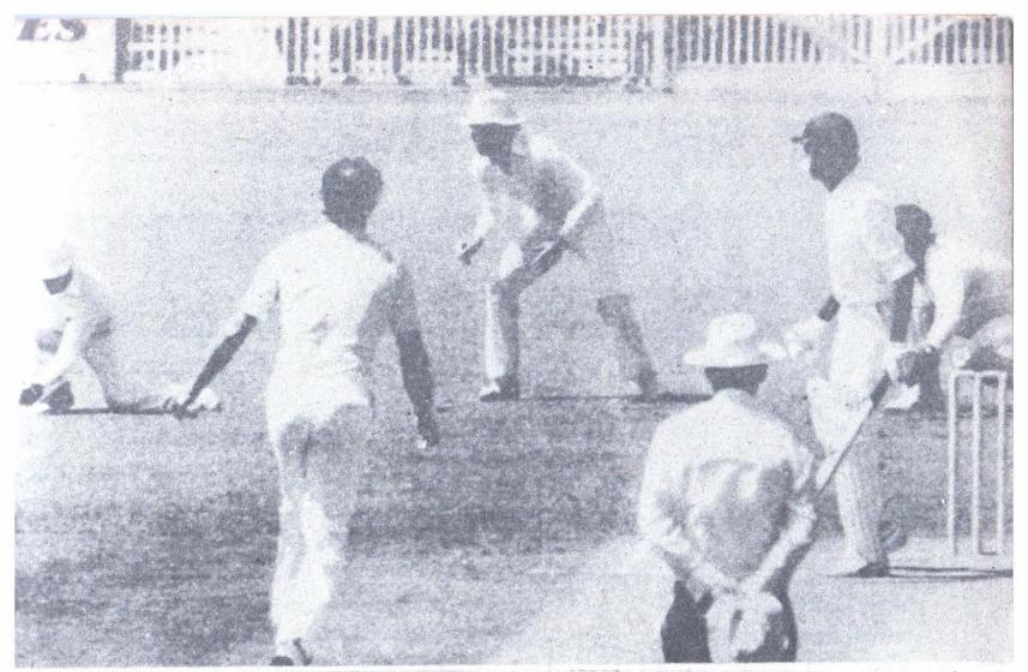

মেলবোর্ন টেস্টে লিলির বলে বেংসরকার বর্ডারের হাতে কট আউট হচ্ছেন। পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে বিতর্কিত আম্পায়ার রেক্স ওয়াইটহেডকে (কালো ট্রাউজার্স)

রাখতে পারেননি। তবে এই বিতর্কিত আউট ভারতীয়দের পক্ষে অনেকটা শাপে বর হয়েছে ; প্রত্যেকটি ভারতীয় খেলোয়াড়কে অনুপ্রাণিত করেছে ম্যাচ জেতার জন্য। মেলবোর্নে ভারত ৫৯ রানে জিতেছে এবং কিছু দাম্ভিক লোককে মুখের মতো জবাব দিতে পেরেছে।

কিন্তু শুরুতে কেউ ভাবতেই পারেনি, ভারত এই টেস্ট জিতবে। মাত্র ১১৫ রানের মধ্যে গাভাসকার, চৌহান, বেংসরকার, পাতিল যশপাল এবং কপিলের উইকেট হারানোর পর মনে হয়েছিল, ভারত হয়তো দেড়শো রানই করতে পারবে না, কিন্তু এই সফরে প্রথম বিশ্বনাথকে তাঁর পুরনো ফর্মে দেখা গেল। যাঁরা বলছিলেন ভিশির দিন ফুরিয়ে গেছে, ভিশি তাঁর রিফ্লেক্স হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের মুখের মতো জবাব দিলেন বিশ্বনাথ—১১৪ রানের একটা অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়ে। বিশ্বনাথের এই ইনিংসটির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় প্রায় ছয় বছর আগে ক্লাইভ লয়েডের দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে তাঁর অপরাজিত ৯৭-এর। ভিনু মানকড় এবং সুনীল গাভাসকারের পর বিশ্বনাথই একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি মেলবোর্নে সেনচুরি করলেন, এটি ওঁর ১২তম শতরান।

২৩৭ মোটেই বড় রান নয়। কিন্তু ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া বিপর্যয়ে পড়ে। ৮১ রানের মধ্যেই ডাইসন, উড এবং হিউজ আউট। গ্রেগ চ্যাপেল আবার রুখে দাঁড়ালেন, মাত্র ২৪ রানের জন্য সেনচুরি পেলেন না। বাঁ-হাতি অ্যালান বরডার অনেকদিন পরে ভাল ব্যাট করলেন—মেলবোর্নের ১২৪ তাঁর ষষ্ঠ টেস্ট সেনচুরি। ডগ ওয়ালটার্স হাঁকালেন ৭৮। অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ৪১৯ রানে ইনিংস শেষ করল।

তৃতীয় দিন চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে গাভাসকার এবং চৌহান যখন ব্যাট করতে গেলেন, ভারত তখন ১৮৩ রানে পিছিয়ে—সবাই ধরে নিয়েছে ভারত এই টেস্ট হারছেই। আটাত্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লাহোর টেস্টে যেমন ঠাণ্ডা মাথায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন গাভাসকার এবং চৌহান, ঠিক তেমনিভাবে ওঁরা ব্যাট করতে লাগলেন মেলবোর্নে। আম্পায়ার ওয়াইটহেড গাভাসকারকে আউট না দিলে প্রথম উইকেটে ১৬৫-র সঙ্গে আরো কিছু রান যোগ হত। মূলত গাভাসকারের ৭০, চৌহানের ৮৫, বেংসরকারের ৪১ বিশ্বনাথের ৩০ এবং পাতিলের ৩৬-এর

দোশি

ঘাউড়ি

দৌলতে ভারত ৩২৪ রানে ইনিংস শেষ করল।

উরুর ব্যথায় কপিলদেব ছটফট করছেন, যাদবের পায়ের আঙুল ভেঙে গেছে ; ওঁরা দুজনেই বল করতে পারবেন না। ভারত মাত্র ১৪২ রানে এগিয়ে। নিয়মিত বোলার একমাত্র ঘাউড়ি এবং দোশি। পাতিল কিছুটা কাজ চালিয়ে নিতে পারেন—এই অবস্থায় ভারত ফীল্ড করতে নামল।

কিছুদিন আগে ঘাউড়ি সম্পর্কে একটা দারুণ কথা বলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক ব্রেয়ারলি। "ঘাউড়ি অদ্ভুত ধরনের বোলার। অনেক সময়ই মনে হয় ওর বোলিং সাধারণ মানের। সবাই যখন ওর কাছ থেকে উইকেটের আশা ছেড়ে দেবে, তখনই হয়তো ঘাউড়ি দু-তিনজনকে আউট করে বসবে।"

ঘাউড়ি ঠিক তাই করলেন। পরপর দু' বলে ফিরিয়ে দিলেন ডাইসন এবং গ্রেগ চ্যাপেলকে। একটু পরে দোশির বলে কিরমানি দারুণ তৎপরতার সঙ্গে স্টাম্প করলেন উডকে। চতুর্থ দিনে খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তিন উইকেটে ২৪—ম্যাচ নাটকীয়ভাবে ভারতের অনুকূলে ঘুরতে শুরু করেছে।

দেশের প্রয়োজন সব থেকে বড়। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে জাঠ কপিলদেব পঞ্চম দিন মাঠে নামলেন। অধিনায়ক গাভাসকার একপ্রান্ত থেকে কপিল এবং অন্যপ্রান্ত থেকে দোশিকে দিয়ে একনাগাড়ে বল করিয়ে গেলেন। কপিলের নিখুঁত নিশানা ও সুইং এবং দোশির প্যাঁচ-ধরানো বলের শিকার হলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসমানরা। লাঞ্চের কিছু পরে মাত্র ৮৩ রানে সকলে আউট। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া এত কম রানে কখনও অল-আউট হয়নি—এতদিন অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন স্কোর ছিল ১০৫ ; ১৯৫৯-৬০ কানপুর টেস্টে।

ভারতের এই জয়কে অনায়াসে ঐতিহাসিক জয় বলা চলে এবং এর সঙ্গে একমাত্র পোর্ট-অব-স্পেনে (৭৫-৭৬) শেষ ইনিংসে চারশোর বেশি রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারানোর তুলনা করা চলে।

মেলবোর্ন টেস্ট জিতে ভারত প্রমাণ করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া আহামরি দল নয় এবং ওদের ব্যাটিং এবং বোলিং প্রধানত গ্রেগ চ্যাপেল এবং ডেনিস লিলির উপর নির্ভরশীল। লিলির কাছে এই টেস্টটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে চেতন চৌহানের উইকেট দখল করে উনি রিচি বেনোর রেকর্ড ভেঙেছেন। লিলি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সফল বোলার। ওঁর সংগ্রহে এখন ২৫১টি টেস্ট উইকেট।

অধিনায়ক হিসেবে গ্রেগ চ্যাপেল এই টেস্টে দুটি ভুল করেছেন। মেলবোর্ন উইকেট স্পিনারদের কিছুটা মদত দেবে ভেবে উনি হগের বদলে হিগ্‌সকে দলে নিয়েছিলেন। এতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদেরই সুবিধা হয়েছে, কারণ ভারতীয়রা পেসের চেয়ে স্পিন বোলিংয়ের মোকাবিলায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং হিগস বা ইয়ার্ডলি কেউই মারাত্মক স্পিনার নন। আর টসে জিতে চ্যাপেল প্রথমে ব্যাট করলে ভাল করতেন, কারণ খেলার শেষে তিনি কবুল করেছেন, "মেলবোর্নের উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা সহজ নয়।"

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

নার্ভাস নাইনটি

অশোক রায়

ব্যাড্ লাকের উদাহরণ চাই? হাতের কাছেই মজুত নামটি হল—চেতন চৌহান। এমনিতে লড়িয়ে ক্রিকেটার। আবার নব্বুইয়ের ঘরে ঘুরপাক খেয়ে সেঞ্চুরির দরজা হারিয়ে ফেলতেও ওস্তাদ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ৯৭-এর কোঠায় পৌঁছেও নির্ঘাত শতরানটি পেলেন না। তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান করার আগেই আউট। দ্বিতীয় ইনিংসে দাঁতে দাঁত চেপে ৮৫-র ঘরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত শতরানের মুখ দেখতে পেলেন না! মন্দভাগ্য আর কাকে বলে! এসো, আজ মন্দভাগ্য ক্রিকেটারদের কথাই শুনি।

১৯৭৯-৮০ মরসুমের শেষ পর্যন্ত মোট ব্যাটসম্যানরা আউট হয়েছেন নব্বুই থেকে নিরানব্বুইয়ের গোলকধাঁধায়। মাত্র একটি রান এবং একটি দীর্ঘনিশ্বাস মাঠে রেখে নিরানব্বুইয়ের হতাশা নিয়ে ফেরার ঘটনা টেস্টে ঘটেছে ছত্রিশ বার। তার মধ্যে ইংল্যান্ডের মাইক স্মিথ এবং জিওফ বয়কটের (একবার ৯৯ নট আউট) পদস্খলন দুবার। নিরানব্বুইয়ে ধাক্কায় বেসামাল ছত্রিশটি ঘটনার মধ্যে চারটি ভারতীয়দের। এঁরা হলেন—পঙ্কজ রায়, অজিত ওয়াদেকার (বনাম অস্ট্রেলিয়া), এম এল জয়সীমা (বনাম পাকিস্তান) এবং রুসি সুর্তি (বনাম নিউজিল্যান্ড)। নিরানব্বুইয়ের মাথায় আউট হবার সবচেয়ে আশ্চর্য এবং রোমাঞ্চকর রেকর্ডটি সৃষ্টি হয় ১৯৭২-৭৩ সালে করাচিতে। পাকিস্তানের মজিদ খাঁ, মুস্তাক মহম্মদ এবং ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস ঐ অভিশপ্ত টেস্টে আউট হন ৯৯-এর কবলে পড়ে। দু-চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নেমে নিরানব্বুইতে ফিরে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার এ জি চিপারফিল্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর জে ক্রিশ্চিয়ানি।

টেস্ট জীবনের শুরুতেই নড়বড়ে নব্বুইয়ে এসে হোঁচট খেয়েছেন সবসমেত কুড়ি জন। এই দুর্ভাগ্য অবশ্য কোনো ভারতীয়কে স্পর্শ করেনি। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের কলিন মিলবার্নের দুঃখ বোধহয় সর্বাধিক। মিলবার্ন ১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট-জীবন আরম্ভ করেন শূন্য দিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে আউট হয়ে যান চুরানব্বুই রান করে।

একই টেস্টের এক ইনিংসে শূন্য এবং আর এক ইনিংসে 'নার্ভাস নাইনটি'র শিকার হয়েছেন এমন ঘটনা ঘটেছে বাইশ বার। এর মধ্যে ইংল্যান্ডের একচল্লিশটি টেস্টের অধিনায়ক পিটার মে বারদুয়েক এমন দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অবশ্য ১৯৭৯-৮০ সালে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের জিওফ বয়কটের দুর্ভাগ্যের কাহিনীও মন ছুঁয়ে যায়। প্রথম দফায় শূন্য হাতে ফেরা বয়কট দ্বিতীয় ইনিংসেও গোড়াপত্তন করতে এসে একে একে সকলকেই চোখের সামনে আউট হয়ে যেতে দেখলেন! শেষ পর্যন্ত সঙ্গীর অভাবে বয়কটের শতরান আর হল না। নিরানব্বুই রানে নট আউট রয়ে গেলেন।

ব্যাড লাকের ব্যাপারে দুটি নামের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এঁরা হলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ক্লেম হিল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারকুটে ওপেনার গর্ডন গ্রীনিজ। ক্লেম হিল মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৯৯ রানে আউট হন। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য তার পরের টেস্টেও হিলের সঙ্গ ছাড়েনি। এডিলেডে পরের টেস্টে দু ইনিংসে হিল আউট হন যথাক্রমে ৯৮ ও ৯৭ রানে। ভাগ্যের কী নির্মম বঞ্চনা!

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বর্তমান ওপেনার গর্ডন গ্রীনিজ সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টেস্টের দু'ইনিংসে যথাক্রমে ৯১ এবং ৯৭ রানে আউট হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। কারণ এই গ্রীনিজ কিছুদিন আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে আউট হয়েছিলেন ৯১ এবং ৯৬ রানে। দু-দুবার এমন দুর্ভাগ্য বরণ করার নজির বিশ্ব-ক্রিকেটে আর কারও নেই। তবে গ্রীনিজের সান্ত্বনা, স্বদেশীয় আলভীন কালীচরণ বার আটেক নব্বুইয়ের ঘরে আউট হয়ে পাশাপাশি হাত মিলিয়ে চলছেন।

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি হাজারিবাগের পিসিমার কাছে পাওয়া এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার খোঁজ মিলেছে। এদিকে হাজারিবাগ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, পিসিমার অ্যাকসিডেন্ট। তারপর...

॥ ৯ ॥

কলকাতা ছেড়েছিল শিশির বেলা দশটা নাগাদ। সামান্য আগে-আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল; পাঠানকোট তো গাড়ি নয়, মালগাড়ি। আচ্ছা এক ট্রেন বাবা! শিয়ালদা থেকে ছাড়ল আধ ঘন্টা দেরি করে। তারপর গদাইলশকর চালে আসানসোল পর্যন্ত এল। ধানবাদে এসে এঞ্জিন বিগড়ে আরও দেরি। গোমোয় এক কান্ড হল। শিশিরদের পাশের কম্পার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে মরতে বসলেন। পরেশনাথে এসে আবার গাড়ি অচল হল। বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল শিশির। এমন জানলে এই গাড়িতে সে আসত না। কিন্তু বেলার দিকে আর গাড়িই বা কোথায়!

হাজারিবাগে পৌঁছবার কথা সন্ধের দিকে, সেই গাড়ি রাত নটা নাগাদ দয়া করে শিশিরকে যথাস্থানে পৌঁছে দিল।

এই রকমই হয়। যখনই তাড়া থাকবে বাধাও এসে জুটবে পরপর। শিশির কত রকম উদ্বেগ-আশংকা নিয়েই না সময় কাটিয়েছে। কী হল পিসিমার? না জানি বাড়ি পৌঁছে কাকে কোন অবস্থায় দেখবে. তাড়া ছিল শিশিরের, অথচ সেই দেরি হয়ে গেল।

কে জানে এ-সব ওই আঙটির জন্যে কি না? কে-এস বারণ করেছিলেন আঙটিটা সঙ্গে নিতে। শিশির একবার ভেবেছিল নেবে না। পরে নিয়ে নিল। মন খুঁতখুঁত করেছিল, ভয়ও হয়েছিল খানিকটা. তবু কেমন যেন জেদ করেই আঙটিটা সঙ্গে নিল। অবশ্য আঙুলে পরল না। প্যান্ট শার্টের সঙ্গে সুটকেসের মধ্যে রেখে দিল। হাতে থাকলে কী হত বলা যায় না, হয়তো শিশির নিজেই একটা আপদ-বিপদ ঘটিয়ে বসত।

যাক্, ভালয়-ভালয় এসে পৌঁছনো গেল, এই যথেষ্ট।

ট্রেন থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে-দৌড়ে শিশির ওভার-ব্রিজের দিকে ছুটল। টিকিটটা কোনোরকমে রেলবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে সিঁড়ি উঠতে লাগল। চেনা মুখ একটাও চোখে পড়ল না। ওভারব্রিজে এসে একবার দাঁড়াল. তাকাল এদিক ওদিক। বাদলা বাতাস গায়ে লাগছে। আকাশে মেঘ। চারদিক ভিজে-ভিজে। বোধহয় সন্ধেবেলায় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এদিকেও তা হলে বর্ষা চলছে!

পিসিমার বাড়ি ধানোয়ার রোডে। হাসপাতাল আর পুকুরের কাছাকাছি। ধীরে-সুস্থে হাঁটলে মিনিট পনেরো, পা চালিয়ে গেলে দশ মিনিট। শিশির জোরে-জোরেই হাঁটতে লাগল।

চারদিক ঘুটঘুট করছে। ডান দিকের বাড়িগুলোয় লোকজন নেই নাকি! একেবারে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। এখানে অবশ্য সবই চুপচাপ থাকে এ-সময়। তবু এখন গরমকাল, নটার মধ্যে এমন নিঝুম হয়ে যাবে কেন? বোধহয় বর্ষার জন্যে।

শিশির ছোটার ভঙ্গিতে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর সেই গাছের ঝোপ। ঝোপের তলা দিয়ে মাঠ ভেঙে যেতে পারলে অনেকটা শর্টকাট হত। কিন্তু সে-সাহস হল না শিশিরের। এ-সব জায়গায় বড় সাপখোপ। বিশেষ করে মাঠে-ঘাটে। তার ওপর গরমকাল, বৃষ্টির দিন। শিশির টর্চও আনেনি।

মাঠের পথ না নিয়ে শিশির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। ট্রেনটাও স্টেশন ছেড়ে চলে

যাচ্ছে। বাঁ দিকে তাকাল। বালিয়াড়ির মতন উঁচু ঢিবি, ট্রেন দেখা গেল না, শব্দটা কানে আসছিল।

পিসিমা কেমন আছেন কে জানে! কী যে হল পিসিমার! বাবা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছেন। "তুই পৌঁছেই আমায় টেলিগ্রাম করবি। তেমন হলে আমাকেও যেতে হবে। আর যদি শশধর বলে, বুড়িকে কলকাতায় আনানো যাবে, নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবি তোরা।"

বাঁ দিকে পরপর দু-তিনটে বাড়ি। বাতি জ্বলছে। শিশির একবার আলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার জোরে পা চালাল।

ট্রেনটা চলে গিয়েছে। কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আচমকা শিশিরের মনে হল, তার পেছন পেছন কেউ আসছে। তাকাল শিশির। কাউকে দেখতে পেল না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

আরও সামান্য এগিয়ে আবার পেছনের দিকে তাকাল শিশির। এবার দেখতে পেল। কে যেন আসছে।

কে?

হয়তো কোনো যাত্রী। কিংবা অন্য কেউ। তবু দাঁড়িয়ে না থেকে শিশির হাঁটতে লাগল।

লোকটাও জোরে-জোরে হেঁটে আসছে।

প্রায় ধানোয়ার রোডের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল শিশির। লোকটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাছে এল লোকটা। মালকোঁচা-মারা ধুতি পরনে, গায়ে শার্ট। লম্বাচওড়া চেহারা। মস্ত এক গোঁফ।

শিশির কথা বলল না। দস্যুর মতন চেহারা—এই লোকটা কে?

শিশিরকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে লোকটাও দাঁড়াল। দেখল শিশিরকে।

"কাঁহা যাইয়ে গা?" লোকটা বলল।

শিশির এতক্ষণ পরে দেখল, লোকটার হাতে একটা লাঠি, রুলের মতন।

"ধানোয়ার রোড," শিশির বলল।

"ভোলাবাবুকো কোঠি?"

"নেহি। শশধরবাবুকো। তালাওকে বাগ্‌ল।"

"আচ্ছা, চলিয়ে।"

শিশির পা বাড়াল। লোকটাও।

নিজের পরিচয় দিল লোকটা। থানার কনস্টেবল। নাম গঙ্গাধর চৌবে। লোকে চৌবে বলে। দিন দুই আগে ভোলাবাবুর কুঠিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। থানার লোকজন একটু নজর রেখেছে এদিকটায়।

শিশির শুনল। দু একটা কথাও বলল। এদিকে ডাকাতি বড় একটা হয় বলে শিশির জানত না। সিজন টাইমে লোকজন বেড়াতে এলে চুরিচামারি হয় বলে শুনেছে।

শিশিরের কী মনে হল, হঠাৎ বলল, "ভোলাবাবুকো কোন কোঠি?"

চৌবে ভোলাবাবুর কুঠির হদিস দিল চিনতে পারল শিশির। বিশাল বাড়ি। ভদ্রলোক নাকি কোলিয়ারি-মালিক ছিলেন একসময়। এখানে থাকেন না। মাঝে-মাঝে আসেন। শিশির ভদ্রলোককে দেখেনি।

হাসপাতালের কাছাকাছি এসে শিশির দাঁড়াল। এবার তাকে মাঠ দিয়েই যেতে হবে।

চৌবে সোজা যাবে।

শিশির মাঠের পথ ধরল।

বাদলা বাতাস আবার জোর হয়েছে। গাছপালার পাতা কাঁপছে শব্দ করে। হাসপাতালের কোয়ার্টারে বাতি জ্বলছিল।

পিসিমার বাড়ির যত কাছাকাছি আসতে লাগল ততই বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল শিশিরের। কী দেখবে, কী শুনবে, কে জানে!

খানিকটা এগিয়ে পিসিমার বাড়ি। বাড়ির ওপাশে পুকুর।

বাড়িতে আলো জ্বলছে।

আলো জ্বলছে দেখে বোধহয় একটু স্বস্তি পেল শিশির।

সদরের ফটক খুলে বাগানে ঢুকল শিশির। ছোট্ট বাগান। সামান্য এগিয়ে বারান্দা। সিঁড়িতে পা দিয়ে কেমন অবশ-অবশ লাগতে লাগল।

"কে?"

পিসেমশাইয়ের গলা। দরজা বন্ধ। তবু গেট খোলা, সিঁড়ি ওঠার শব্দ কানে গিয়েছে পিসেমশাইয়ের।

"আমি।"

দরজা খুলে শশধর বাইরে এলেন। শিশিরকে দেখে কেমন অবাক। "তুই? এখন? কোত্থেকে?"

শিশিরেরই অবাক হবার পালা। কেমন বোকার মতন সে বলল, "টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কী হয়েছে পিসিমার?"

শশধর কিছুই যেন বুঝতে পারছিলেন না। "টে-লি-গ্রাম? কার?"

"আপনার।"

"আমার টেলিগ্রাম? কাকে? কবে? কী বলছিস তুই?"

শিশির কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল।

"কে গো?" ভেতর থেকে পিসিমার গলা শোনা গেল।

"শিশির।...আয়, ভেতরে আয়।"

সুটকেস হাতে শিশির ঘরে এল।

পিসিমা ততক্ষণে ঘরে এসে হাজির হয়েছেন। ভাইপোকে দেখে যত খুশি, ততই অবাক। সামনে এসে শিশিরের গালে হাত বোলাতে লাগলেন। "তুই, হঠাৎ?"

"আমি হঠাৎ, না তুমি হঠাৎ—" শিশির কথা গোছাতে পারল না। ভাল করে পিসিমাকে দেখল। তার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! এই তো পিসিমা দিব্যি হাসিখুশি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে। পাশেই পিসেমশাই।

শিশির বলল, "কাল একটা টেলিগ্রাম পেলাম কলকাতায়। তোমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সাংঘাতিক। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিল।"

"অ্যাকসিডেন্ট? আমার? বলিস কী?"

শশধর বললেন, "টেলিগ্রাম ভাল করে দেখেছিস?"

"বাবা দেখেছে।"

"কিন্তু আমরা তো কোনো টেলিগ্রাম করিনি।"

শিশির সেটা বুঝতে পারল। কেন টেলিগ্রাম করবেন পিসেমশাই? পিসিমা তো চমৎকার রয়েছেন। এ নিশ্চয় ভাঁওতা। কিন্তু কেন?

"তুই এত রাত করে এলি?" পিসিমা বললেন।

"ট্রেন লেট। দাঁড়াও। আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি ঠিকই আছ। পিসেমশাইও টেলিগ্রাম করেননি। তাহলে কে মিথ্যে টেলিগ্রাম করল? করলই বা কেন?"

"দাদা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।...না, টেলিগ্রাম পাবার পর থেকে দুশ্চিন্তা করছে।"

শশধর বললেন, কই, টেলিগ্রামটা কোথায়?"

"টেলিগ্রাম কি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বাবার কাছে আছে।"

শশধর সামান্য ভাবলেন। বললেন, "কোনো ভুল হয়নি তো?"

মাথা নাড়ল শিশির। তারপর বলল, "এটাও ওই আঙটির ব্যাপার? কেউ আমাকে ভুলিয়ে এখানে হাজির করতে চাইছিল।"

"আঙটি? কোন আঙটি?" পিসিমা বললেন।

"তোমার ওই সিসের আঙটি। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার।"

(ক্রমশ)

ছবি: সুনীল শীল

ভুল শুধরে নাও: ২৮ জানুয়ারির আনন্দমেলায় 'সেই খুশি সেই রঙ' রচনায় দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গের বি সি রায় মেমোরিয়াল চিলড্রেন'স লাইব্রেরি সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, "ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক লক্ষ টাকা দান করে প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করেন।" টাকাটা আসলে দিয়েছিলেন ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটী। কমিটীর সভায় (১১ মার্চ, ১৯৬৫) গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, স্বর্গত বিধানচন্দ্রের নামে উক্ত লাইব্রেরি অথবা পাঠকক্ষের নামকরণ হবে, এই শর্তে টাকাটা দেওয়া হোক।

কালীঠাকুমা

প্রদীপচন্দ্র বসু

ছোটবেলা থেকেই আমার দুজন ঠাকুমা। প্রথমজন আমার নিজের, আর দু'নম্বর ঠাকুমা, যাকে আমি কালীঠাকুমা বলে ডাকি, নিজের না হলেও নিজের মতো। আমি দুই ঠাকুমারই আদর খেয়ে আসছি। কোনও তফাত নেই। বহরমপুরের নয়া সড়কের কাছে আমার মামার বাড়ি। কালীঠাকুমার বাড়িও ওখানেই। বিয়ে হয়ে আমার দিদিমা আর উনি একই দিনে স্বামীর ঘর করতে এসেছিলেন পাশাপাশি বাড়িতে। সেই থেকে কালীঠাকুমা আমার দিদিমার জবাফুল। মায়ের মাসিমা। মায়ের কাছে শুনেছি জন্মাবার পর আমি নাকি অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। গ্রাম দেশে তখন এত ডাক্তার-বদ্যি ছিল না। কালীঠাকুমা আমাকে কোলে নিয়ে ঠায় দুদিন বসে ছিলেন। অনেক মন্ত্রতন্ত্র পড়ে বাঁচিয়েছিলেন আমাকে। পৃথিবীতে চোখ মেলে আমি নাকি প্রথম ওঁর মুখ দেখেছি।

কালীঠাকুমা তান্ত্রিক। মিষ্টি চেহারা। জটাজুটো নেই। ফরসা গায়ের রঙ। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মা কালীকে নিয়েই জীবন কাটাচ্ছেন। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে উনি নাকি ঘুমোন না। সারা রাত বসে-বসে মালা জপেন। একটা ফল বা একটু দুধ ওঁর সারাদিনের খাদ্য। ছেলেবেলা থেকেই কালীপুজো করতে দেখে আসছি বলে আমি ঠাকুমাকে কালীঠাকুমা বলে ডাকি। তবে শুধু কালীপুজো নয়, সারা বছর ধরে কালীঠাকুমা অজস্র ঠাকুর-দেবতার পুজো করেন।

কালীঠাকুমার বাড়িতে উনি ছাড়া আর কেউ থাকে না। বাড়ি বলতে খান দুই টিনের ঘর, বাথরুম আর রান্নার চালা। লাগোয়া খানিকটা জায়গায় ফুল-ফলের বাগান আছে। বাগানের মধ্যে কালীমন্দির। কালীঠাকুমার এক ছেলে বাইরে থাকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলেও কেউ মায়ের কাছে এসে থাকতে পারে না। থাকবে কী করে? কালীঠাকুমার পোষা বেড়াল-কুকুর আর পায়রাগুলো যা নচ্ছার। মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। বাড়িটাকে সবসময় আঁস্তাকুড় বানিয়ে রাখে। এছাড়া কালীঠাকুমার আরও যারা পোষ্য আছে তাদের সবাই ভয় পায়। তবে পুজোটুজোর সময় অনেকে যায়। একবার মায়ের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম কালীঠাকুমার কালীপুজো দেখতে।

তখন আমি খুব ছোট। বোধহয় ক্লাস থ্রী কি ফোরে পড়ি। মামার বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে সন্ধে-রাতে কালীঠাকুমার বাড়ি পৌঁছে দেখি পুজোর আয়োজন চলছে। নিজে - নিজেই সব করছেন কালীঠাকুমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুজোয় বসবেন। সেজন্য খুব তাড়া। সারা রাত ধরে পুজো হবে।

পুজোয় লোকজন আসবে বলে ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়েছে। মা আমাকে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে শুইয়ে দিলেন, যাতে পুজো শুরু হওয়ার আগে আমি খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারি। রাত জেগে পুজো দেখতে হবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ ধুপধাপ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল ছাদের ওপর কারা যেন নাচানাচি করছে। গা ছমছম করে উঠল আমার। চেয়ে দেখি ঘরে মা নেই। দরজা খোলা। যে-ঘরে শুয়েছিলাম তার সোজাসুজি বাগানের মধ্যে মন্দির দেখা যাচ্ছিল। একা-একা উঠে বাইরে যেতে সাহস হচ্ছিল না। অগত্যা বিছানায় শুয়ে-শুয়েই আমি মন্দিরে কালীঠাকুমার পুজো দেখতে লাগলাম। অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে প্রথম কার্তিকের হিম। দূরে কোথাও মাঝে-মাঝে কুকুর ডাকছে। শেয়ালের চিৎকারও শোনা যাচ্ছে থেকে-থেকে। মন্দিরের চত্বরে একটা হ্যাজাক জ্বলছিল। অন্ধকারে বাগানের গাছপালার ওপর হ্যাজাকের আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ায় গাছপালাগুলিকে প্রেতের মতো দেখতে লাগছিল। মন্দিরে পুজো করছেন কালী ঠাকুমা।

সেবার খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। আর কখনও যাইনি কালীঠাকুমার কালী-পুজো দেখতে। মায়ের কাছে পরে জেনেছিলাম, ছাদের ওপরে যারা লাফাচ্ছিল তারা কেউই রক্তমাংসের মানুষ নয়।

কালীপুজো ছাড়াও কালীঠাকুমার সব কাজেই এরকম রহস্য ছিল। প্রথম প্রথম শুনলে অদ্ভুত মনে হয়। প্রতি বছর একবার করে গয়া যেতেন উনি। যেসব মানুষ অপঘাতে মরে, যাদের পিন্ডদান করার কেউ নেই, গয়ায় তাদের আত্মার মুক্তির জন্য পিন্ড দিতেন কালীঠাকুমা। এই কাজ উনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। চেনা-অচেনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কালী-ঠাকুমার বড় মেয়ে ফুলটুপিসির কাছে শুনেছিলাম, গয়া যাওয়ার দিনটিন ঠিক হলে অনেক ভূত-পেতনি এসে কালীঠাকুমাকে অনুরোধ করে যেত পিন্ড দিয়ে ওদের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে। মানুষের ঘাড় মটকানো ছেড়ে তাহলে ওরা স্বর্গে গিয়ে আরামে থাকতে পারে। আবার অনেক পরিচিত মানুষও এসে অনুরোধ করত তাদের হয়ে কাজটা কালীঠাকুমাকে করে দেওয়ার জন্য। সবার অনুরোধই রাখতেন কালীঠাকুমা।

কালীঠাকুমার সঙ্গে একবার গয়া যাওয়ার সময় এর প্রমাণ পেয়েছিলাম আমি। গয়ায় আমার অবশ্য কোনও কাজ ছিল না। নিছক বেড়ানোর জন্য যাওয়া। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে ছিলাম। গয়া যাওয়ার আগে কালীঠাকুমা বহরমপুর থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

কালীঠাকুমাকে দেখে মা আমাকে বললেন, "খোকা, যা, মাসিমার সঙ্গে তুইও গয়া থেকে ঘুরে আয়। তোরও বেড়ানো হবে, আর, মাসিমার বয়স হয়ে গেছে, তুই সঙ্গে গেলে দেখেশুনে রাখতে পারবি।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তারপর একদিন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গয়া প্যাসেঞ্জারে চাপলাম আমরা। রাত পৌনে নটা নাগাদ ট্রেন ছাড়ল। পুরো একরাত ট্রেনে কাটাতে হবে।

ব্যান্ডেল পার হতে ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা বাজে। ট্রেন চলছে ঢিমে তালে। পরের স্টেশন বর্ধমানে আবার থামবে। আমরা যে কামরায় উঠেছিলাম সেটা খুব ছোট। আলোটালো বিশেষ নেই। একটা বাল্‌ব মিটমিট করে জ্বলছে। শিয়ালদহ থেকে যারা সহযাত্রী হয়েছিল প্রায় সবাই নেমে গেছে। আমি আর কালীঠাকুমা ছাড়া শুধু একজন দেহাতি লোক বাংকের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। দুটো সিঙ্গল সীটে মুখোমুখি আমি কালীঠাকুমার সঙ্গে বসেছি। ঠাকুমার চোখ আধবোজা, হাতে জপের মালা। আমি জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম। অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন ছুটছে।

গরমকালের রাত্রি। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকে শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। একটু পরেই ঘুম পেয়ে গেল। আমার অবস্থা দেখে কালীঠাকুমা বললেন, "খোকা, ওপাশে খালি সীটে গিয়ে তুই শুয়ে পড়। কোন চিন্তা নেই। আমি তো জেগেই থাকব!"

বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। মাঝে কত স্টেশনে গয়া প্যাসেঞ্জার

থেমেছে আবার ছেড়েছে, ওঠানামা করেছে লোকজন—আমি কিছুই জানতে পারিনি। হঠাৎ একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ মেলে দেখি টিকিট-চেকার উঠেছে কামরায়। আমাদের সীটের কাছে এসে টিকিটের জন্য হাত বাড়িয়েছে কালীঠাকুমার দিকে।

বাইরে অন্ধকার। কামরার ভেতরে সেই মিটমিটে আলো। ট্রেন বেশ জোরে চলছে এখন। প্রথম রাতের আলস্য আর নেই। ঘুমভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে আমার মনে পড়ল, টিকিট আমি নিজের পকেটে রেখেছি। কালীঠাকুমা দেবেন কী করে?

তাড়াতাড়ি টিকিট বের করতে যাব, তার আগেই ভয়ে হিম হয়ে গেল আমার ভেতরটা। হাত আটকে গেল পকেটের মধ্যে। টিকিট দেওয়া হল না।

ঘুম জড়িয়ে ছিল চোখে। প্রথমে ভাল করে দেখিনি টিকিট-চেকারকে। কালো কোটপ্যান্ট পরা দেখে আন্দাজ করেছিলাম। টিকিট বের করার সময় মুখের দিকে তাকাতেই দেখি টিকিট-চেকারের পোশাক-পরা ধড়ের উপর মুন্ড নেই। দুটো হাত কালীঠাকুমার সামনে জোড় করে খুব কাতরভাবে কিছু চাইছে। অনেকটা ভিক্ষে চাওয়ার মতো। ভয়ার্ত চোখে আমি কালীঠাকুমার মুখের দিকে তাকালাম। দেখি কালীঠাকুমা বড়-বড় চোখে দেখছেন টিকিট চেকারকে। মুখে কিছু বলছেন না। মুন্ডহীন টিকিট-চেকারও কথা বলতে পারছে না। অসহায়ভাবে শুধু হাত নেড়ে কী যেন বোঝাতে চাইছে!

একটু পরে কালীঠাকুমা ধীর গলায় বললেন, "ঠিক আছে। যা—।"

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে অবিশ্বাস্য-ভাবে মুন্ডহীন টিকিট-চেকার চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হাত-পায়ের লোম কখন খাড়া হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। কথা বলতে পারছিলাম না। কামরায় আর কেউ নেই। বাংকের ওপরের দেহাতি লোকটাও কখন নেমে গেছে জানি না। ঝিম ধরে বসেছিলেন কালীঠাকুমা।

আস্তে-আস্তে ট্রেনের স্পীড কমে এল। বোধহয় কোনো স্টেশনে আসছে। ট্রেন থামবে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কালী-ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠাকুমা, কী ব্যাপার বলো তো?"

"ও কিছু না।" আমাকে আশ্বস্ত করতে ঘটনাটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন কালীঠাকুমা। আমার কৌতূহল কিন্তু কমল না। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "ওই মুন্ডহীন টিকিট-চেকার তোমার কাছে কী চাইছিল?" প্রশ্ন শুনে কালীঠাকুমা আমার চোখে চোখ রেখে দু এক মুহূর্ত কী যেন দেখলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "বুঝলি না, ও আমার কাছে পিন্ড চাইতে এসেছিল। আমাকে বোধহয় চেনে!"

"তুমি ওকে চিনতে পারলে!"

"না রে।"

"তাহলে কী করে পিন্ড দেবে?"

"দেখি কী করে দিই।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কালীঠাকুমা। বললেন, "অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে বেচারার। খুব সম্ভব ট্রেনেই কাটা গেছে।"

যে স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল সেটা ছেড়ে গেছে। কয়েকজন যাত্রীও উঠেছে আমাদের কামরায়। ওদের কথাবার্তায় কামরার মধ্যে আগেকার থমথমে ভাবটা আর নেই। হাত-ঘড়িতে দেখলাম সোয়া তিনটে বাজে। আবার মালা জপতে শুরু করলেন কালীঠাকুমা।

গয়ায় অন্যসব কাজের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই মুন্ডহীন টিকিট-চেকারের আত্মার উদ্দেশেও পিন্ড দিলেন কালীঠাকুমা। পিন্ড দেওয়ার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে তৃষ্ণার্ত আত্মা, তুমি যেই হও, এই পিন্ড গ্রহণ করে শান্তি লাভ করো।"

দিনতিনেক আমরা ছিলাম গয়ায়। তার-পর ফিরে এলাম। কলকাতা এসেই কালী-ঠাকুমা খুঁজতে শুরু করলেন তাঁর পরিচিত কে টিকিট-চেকারের চাকরি করত? ট্রেনে কাটা পড়ে কে মারা গেছে? খুঁজতে-খুঁজতে কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল কালীঠাকুমার দূর-সম্পর্কের এক ভাসুরপো বিহারে টিকিট-চেকারের চাকরি করতেন। আমরা যে রাত্রে গয়া যাচ্ছিলাম তার ঠিক আগের রাতেই চলন্ত ট্রেন থেকে আচমকা পড়ে গিয়ে মারা গেছেন উনি।

ছবি রতন সেন

মানুষ ডাকাত

অমরনাথ দে

অনেকদিন আগের কথা বলছি। গ্রাম-বাংলায় তখন এত রাস্তাঘাট হয়নি। এখনকার মতো মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, দিগন্তে তালগাছ-ঘেরা ছোট্ট ছবির মতো গ্রামের প্রান্ত ছুঁয়ে বাসও ছুটত না।

এমনি একটা দিনে গোরুর গাড়িতে করে হরিশঙ্করবাবু চলেছেন ভাইঝির বিয়েতে! বারো মাইল পথ। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, তারপর শাল-মহুয়ার জঙ্গল, আবার মাঠ, তারপর গ্রাম। হরিশঙ্করবাবুর দাদা নেই, তাই কন্যা-সম্প্রদান করতে হবে তাঁকেই। গোরুর পিঠে গাড়ি জুড়েছেন যথাসময়েই। সূর্য তখন মাথার উপর। সঙ্গে আছেন ছেলের বউ আর নাতি সোমনাথ।

সোমনাথের তো খুব মজা। পিসিমণির বিয়ে। খুব হৈ-চৈ হবে ওখানে। তাছাড়া গোরুর গাড়িতে দোলা খেতে খেতে যাওয়ারও একটা আনন্দ আছে।

শীতের ছোট বেলা। জঙ্গলে ঢুকতে না ঢুকতেই বেলা পড়ে এল। তারপর সেদিন এমনই দুর্বিপাক যে, জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল গাড়োয়ান মাধব। হরিশঙ্কর-বাবু সারাদিন উপোস করে আছেন, তাই গাড়ির মধ্যে খড়ের বিছানায় প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। জঙ্গল পার হতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু কেটে গিয়েও যখন জঙ্গল পার হল না, তখন হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসলেন গাড়ির মধ্যে। গাড়োয়ান মাধবকে বললেন, "হ্যাঁ রে মাধব, জঙ্গল যে শেষ হল না। নিশ্চয় পথ ভুল করেছিস।"

মাধব আগেই বুঝতে পেরেছে কোথায় যেন গোলমাল হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে একই ধরনের অনেক রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। প্রথম রাস্তাটা ভুল করতেই গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে। মাধব মাথা খাটিয়ে, সূর্যাস্তের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে, গাড়ির চাকার শব্দে জঙ্গলের গভীরতা আন্দাজ করে, অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছে কী করে জঙ্গলের বাইরে বেরোনো যায়। কিন্তু পারছে না। ও তাই উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবু, পথ ভুল হয়ে গেছে।"

পথের নিশানা পাওয়ার আগেই রাত্রি ঘনিয়ে এল। গোরু দুটোও ক্লান্ত। অন্ধকার আকাশে অজস্র তারা ফুটে উঠেছে। একটা বড় গাছের নীচে গাড়ি থামিয়ে গোরুগুলোকে সবে একটু জিরোন দেওয়ার কথা ভাবছে মাধব, এমন সময় হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটা জোরালো টর্চের আলো দেখা গেল। হরিশঙ্করবাবুও আলোটা দেখেছেন। উনি ফিসফিস করে বললেন, "ঈশ্বরের নাম করো, আমার মনে হচ্ছে ডাকাতের হাতে পড়েছি।"

সকলেই চুপচাপ। সোমনাথ লুকিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। হরিশঙ্করবাবু ফিস ফিস করে অনর্গল ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলেন। মাধব নিঃশব্দে বসে থাকল। হাতের মুঠোর মধ্যে গোরু-তাড়ানো ছড়িটা কষে ধরল। গোরু দুটোও যেন বুঝতে পারল, কোনো একটা অঘটন ঘটতে চলেছে।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

এবার বিভিন্ন দিক থেকে আকাশের দিকে অনেকগুলো টর্চের আলো পড়তে লাগল। সব আলোর নিশানাগুলো যেন মনে হল এক জায়গায় এসে মিশেছে। বোধহয় ওদের কোনো সঙ্কেত।

ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। মনে হল জঙ্গলের ডাল পাতা মাড়িয়ে যেন অনেক লোক এদিকে এগিয়ে আসছে। সকলেই ভাবছে এ যাত্রা আর রক্ষে নেই। বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সকলেরই। গোরু দুটো মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল, এখন তারাও ভয়ে জড়োসড়ো।

মুহূর্তে অনেকগুলো টর্চের আলো এসে পড়ল গাড়ির ওপর। কয়েকজন লোক একসঙ্গে হুংকার দিল, "কে রে ওখানে?" ভয়ে সোমনাথের মা সংজ্ঞা হারালেন।

লাঠি আর বল্লম নিয়ে প্রায় জনা পঁচিশেক লোক এসে ঘিরে ফেলল গোরুর গাড়িটাকে। ক'জন লোক টেনে নামাল মাধবকে। হরিশঙ্করবাবুকেও টেনে নামাতে গেল কয়েকজন লোক। হরিশঙ্করবাবু এতক্ষণ হাত জোড় করে ইষ্টদেবতার নাম জপ করছিলেন। সেই ভাবেই তিনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন আর কেঁদে উঠলেন। অমন উন্নত নাক, সুন্দর চেহারা, শনের মতো পাকা চুল দেখে কী যেন ভাবল ডাকাত-সর্দার।

হরিশঙ্করবাবু কাঁদতে কাঁদতে ডাকাত-সর্দারের কাছে সব কথা খুলে বললেন। বললেন, তিনি না গেলে ভাইঝিটির বিয়েই হয়তো হবে না। কন্যা-সম্প্রদান করবে কে? তাছাড়া টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি অধিকাংশই তো হরিশঙ্করবাবুর কাছে। বরপক্ষ হয়তো বিয়ের পিঁড়ি থেকেই বরকে তুলে নিয়ে চলে যাবে।

হরিশঙ্করবাবু তাঁর টাকার থলি, গয়নার বাক্স, সব খুলে দেখালেন ডাকাত-সর্দারকে। বললেন, "বাবা, তোমরা সব কিছু নাও, আমাদের প্রাণে মেরো না।"

হরিশঙ্করবাবুর কথা শুনে ডাকাত-সর্দার একটু থমকে দাঁড়াল।

দুজন বল্লম উঁচিয়ে ছিল হরিশঙ্করবাবুর বুকে। হঠাৎ ডাকাত-সর্দারের বজ্রকণ্ঠের আদেশে মুহূর্তে বল্লম দুটো সরিয়ে নিল ওরা। ডাকাত-সর্দারের মনে বোধহয় করুণার উদ্রেক হল। তারপর ওদের মধ্যে ক'জনকে আদেশ দিল, "এই, তোরা পথ দেখিয়ে এঁদের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আয়।"

হরিশঙ্করবাবুর উদ্দেশে বলল, "বাবু, আমরাও মানুষ, আপনার কোনো ভয় নেই। আমার লোক আপনার টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি সব কিছু সমেত পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনার গ্রামে। আপনার ভাইঝির বিয়ের কোনো অসুবিধা হবে না।"

হরিশঙ্করবাবু মনে-মনে ভাবলেন— ডাকাত হলেও এরা প্রকৃত মানুষ।

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো কেটে গেল। গোরুর গাড়িটা আবার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে এগিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

ছবি দেবাশিস দেব

Interpur/CBI/6/80 Ben

কাঠ-ঠোকরার এই ছবিটা ভাল লাগছে না? বেশ তো, রঙ-পেনসিল বুলিয়ে একে রঙিন করে দাও।

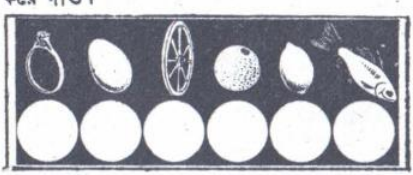

উপরে যাদের ছবি দেখছ ইংরেজিতে তাদের নামগুলি ভাবো। তারপর প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর তার নীচের বৃত্তের মধ্যে বসাও। সবটা মিলিয়ে কী পেলে? ফুল। তাই না? ফিশ, লেমন, অরেঞ্জ, হুইল, এগ আর রিং-এর আদ্যক্ষর পরপর বসালে হয় 'ফ্লাওয়ার'।

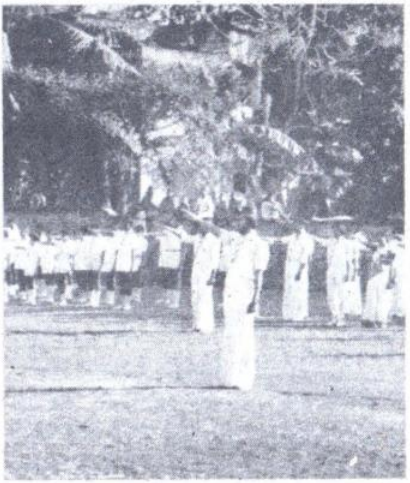

সম্প্রতি বসিরহাট কলেজ প্রাঙ্গণে মণিমেলা মহাকেন্দ্রের বার্ষিক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় দুশো শিক্ষার্থী এই শিবিরে দশ দিন ধরে সংগঠন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সবকিছু শিক্ষা নেয়। শিবির উদ্বোধন করেন বসিরহাটের মহকুমা-শাসক এবং শিক্ষার্থীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রমেশ দাস। স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষত ছোটদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা যায়, এবং সকলেই এমন শৃঙ্খলাপরায়ণ শিক্ষাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছোটদের যত সেরা বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বার যা ছিল না কার্সিয়াং। সঙ্গে ছিল সরু, লম্বাটে একটি খাতা। ট্রেনে উঠেই খুলে বসলেন সেই খাতাখানা। চারপাশে যা-যা দৃশ্য ছিল ছড়িয়ে, আর যা-যা উপলব্ধি এল তাঁর মনে—সেই সমস্তকিছুকে টুকরো ছবির মতো ধরে রাখতে শুরু করলেন খাতাটাতে। জাদুময়, শব্দের আঁচড়ে ডাইরির মতো সেইসব লেখা নিয়ে বেরিয়েছে একটি দুর্লভ স্বাদের বই—'হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা'। শুধু সেই লেখাই নয়, আরও অনেক লেখা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই বইতে যা নানা দিক থেকে একইরকম আকর্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি এই বইকে আরও দামী করে তুলেছে।

সাধনা মুখোপাধ্যায় শুধু কবিতাই লেখেন না, ছোটদের জন্যও একটি আশ্চর্য কৌতূহল-মেটানো বই লিখেছেন, সে-বইয়ের নাম 'জানা অজানা'। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এই বইটি স্বাদে সুন্দর, তথ্যে সমৃদ্ধ। বাংলা বারো মাসের বৈশিষ্ট্য কী-কী, পরিচয় কেমন, এসব নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে ভৌগোলিক বহু বিচিত্র খবর যা প্রায় গল্পের মতো কৌতূহলকর। 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন—"সত্যি বলতে কী, পৃথিবী ও আকাশের বিচিত্র সব রহস্যের কথা এমন সহজ ও সুন্দর বাংলায় এত প্রাঞ্জল করে এ-কালে আর-কেউ বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন বলে তো আমার মনে হয় না।"

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ গোঁসাইবাগানের ভূত ৮ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৫ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাস-বাড়ি ৫ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজকুমারের পোশাকে ৪ গজ উকিলের হত্যা রহস্য ৮ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১০ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ রাত একটা ৪ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ দাশরথির বাহাদুরি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মণ্ডিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১২ আরো এক ডজন ১২ ফটিকচাঁদ ৮ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ মাধুরীলতার গল্প ৬ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃষ্ণাল ১০ **দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের** কথায় কথায় ১০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

॥ ১৬ ॥

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচ বর্মার সঙ্গে। খেলার দিন সকালেই গোলকীপার সনৎ শেঠ বললেন, "আজ আমি খেলব না, থঙ্গরাজ খেলুক।" আগেই বলেছি, প্রথম ম্যাচে সিংহলের পিটার রণসিংঘে যখন ফ্রী কিক নেন, সনৎ শেঠ সবাইকে সরে যেতে বলেছিলেন, কোনো ওয়াল গড়তে দেননি। সরাসরি ফ্রী কিকে গোল করে দিয়েছিলেন রণসিংঘে। সনৎ শেঠ নিজে চাইলেও, ক্যাপ্টেন আজিজ দেশের সেরা গোলকীপারকে বসাতে চাননি। কিন্তু সনৎ শেঠের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত থঙ্গরাজই সুযোগ পেলেন। ঢাকায় আমরা তিনজন—লতিফ, থঙ্গরাজ এবং আমি—ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। থঙ্গরাজ জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়ায় লতিফ ও আমি স্বভাবতই খুশি হলাম।

গোলকীপার থেকেই পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়—এই কথাটি আমাদের শিখিয়েছিলেন ব্রিটিশ কোচ রন মিডস। থঙ্গরাজ গোলকীপারের ভলিতে বল পাঠাতে পারতেন সত্তর-পঁচাত্তর গজ দূরে। বল ছুঁড়েও দিতে পারতেন চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়ানো সতীর্থ খেলোয়াড়ের পায়ে। আমাদের সঙ্গে থঙ্গরাজের বোঝাপড়া ছিল, থঙ্গরাজ বল ধরে দুটো ড্রপ দিলে বুঝব বড় কিক হচ্ছে। একটা ড্রপ মানেই হাত দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পাস।

আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রথম বল ধরেই থঙ্গরাজ দুটো ড্রপ দিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমি বর্মার গোলের দিকে ছুটতে শুরু করলাম। এত বড় ভীড় দর্শকরা কখনও দেখেননি। তাদের হর্ষ-ধ্বনির মধ্যেই বল পড়ল বর্মার পেনাল্টি বক্স থেকে গজ পাঁচেক দূরে। মেওয়ালালের বদলে এইদিন থেকে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে এসেছেন নৈভিল ডিসুজা। দুর্ধর্ষ এই সেন্টার ফরওয়ার্ডের গতি বেশি না থাকায় বল থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোনাকুনি ছুটে আমি বলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। বল ড্রপ পড়ে প্রায় পনরো ফুট ওপরে উঠে গোললাইন থেকে বারো গজের মাথায় পড়ছিল। বর্মার গোলকীপার হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। বল যখন ফের মাটিতে পড়ার মুখে প্রায় আট গজ উপরে, তখন বুঝলাম, মরিয়া না হলে কিছু করা যাবে না। একই সঙ্গে হাই জাম্প এবং লং জাম্প করলে যা হয়, আমাকে তাই করতে হল। ঐ প্রচন্ড গতির মধ্যেই লাফিয়ে এবং সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে হেড করলাম। গোলকীপারের বাঁ হাতের নাগাল এড়িয়ে বল জালে জড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় গোল করলেন নৈভিল ডিসুজা। আমার পাস থেকে তৃতীয় গোলটি পেলেন কিট্টু। আমাদের ডিফেন্সে ভুল-বোঝাবুঝির জন্য বর্মার বিখ্যাত রাইট উইঙ্গার সুখ বাহাদুর একটি গোল শোধ করলেন। আমরা পাল্টা আঘাত হানলাম। আমার ব্যাকপাস থেকে ভারতের পক্ষে চতুর্থ গোলটি করলেন নৈভিল ডিসুজা। এরপর আমি দুটো গোলের সুযোগ নষ্ট করলাম। একবার ডান পায়ের শট পোস্টে লাগল। আর একবার বারো গজ দূর থেকে আমার ড্রপ শট বারে লেগে ফিরে এল। দুবারই প্রচন্ড জোরে শট নিয়েছিলাম। খেলাশেষের দু-তিন মিনিট আগে সাত্তারদার কল্যাণে আর একটা সুযোগ পেলাম। শুধু গোলকীপার আর আমি। গোলকীপার বাঁ-দিকে অনেকটা জায়গা ছেড়ে আমাকে সেই দিকেই শট নেবার জন্য লোভ দেখালেন। এটা গোলকীপারদের একটা পরিচিত কৌশল। ঐ ফাঁদে পা দিলে, গোল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ গোলকীপার সেই দিকে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যই সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটা নিলাম। গোলকীপারের ইচ্ছা

স্বপন শেঠ

অনুযায়ী বাঁ দিকেই প্রচন্ড জোরে শট নিলাম। গোল। আমরা ৫—২ গোলে জিতলাম।

জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও দুটি গোল পেয়ে স্বভাবতই খুব খুশি ছিলাম। কিন্তু খুশির মেজাজ ভেঙে দিলেন সামাদ সাহেব। খেলার পর হোটেলে আমার ঘরে এসে প্রথমেই বললেন, "এক শটে দুই গোল হয়? অত জোরে মারাতেই তো দুটো বল বারপোস্টে লাগল। দেখে মারলে আরো দুটো গোল হত।"

টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচ পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানও দুটো ম্যাচ জিতেছে। গোল অ্যাভারেজ (তখনকার নিয়মে) ওদেরই ভাল থাকায়, ম্যাচ ড্র হলে চ্যাম্পিয়ন হবে পাকিস্তান।

খেলার আগের দিন ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হল। এর আগে কলম্বো এবং রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারত আর পাকিস্তান জয়েন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অবশ্য দেশের মাটিতে (কলকাতায়) কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তানকে হারিয়ে। পুরণ বাহাদুর হ্যাটট্রিক করেছিলেন। বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করলেন, দেশের মাটিতে পাকিস্তান জিততে পারে, যদি ভারতের তরুণ রাইট উইঙ্গারটিকে আটকে রাখা যায়। আমার সাফল্যে দারুণ খুশি হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ। কিন্তু আমাকে নিয়ে অত নাচানাচি হওয়ায় কিছুটা বিরক্ত হলেন সঙ্গত কারণেই ভয় পেলেন, ছেলেটার মাথা না বিগড়ে যায়। তাছাড়া, আজিজ এবং ম্যানেজার সরোজ বসুর ভয় ছিল, আজেবাজে খাবার খেয়ে হয়তো আনফিট হয়ে যাব। তাই হোটেলের খাওয়া বন্ধ, আমার জন্য খাবার আসছিল হাই-কমিশনার মিঃ রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে। প্রায় নজরবন্দী হয়ে গেলাম।

এদিকে একটা বিপদ হয়েছে। ঢাকার বিখ্যাত ফুটবলার আরজু ওঁদের ক্লাবের একটা ফাংশানে যাবার জন্য আগে থেকেই অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন। ঘরোয়া অনুষ্ঠান। ক্লাবের মেম্বাররা আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটি হল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ঠিক আগের দিন! যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু না গেলে আরজু কী ভাববেন! ভয়ে-ভয়ে আজিজকে সব কথা জানালাম। আজিজ বললেন, "যেতে পারো, কিন্তু ম্যানেজার যেন জানতে না পারেন। আর হ্যাঁ, ওখানে কিছু খেও না যেন!"

দুপুর দুটোর সময় নিখিল নন্দী আর আমি হোটেল থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে গেলাম। দেখতে-দেখতে ঐ ক্লাবে প্রায় সাতশো লোক জমে গেলেন। ক্লাবের মেম্বাররা ছাড়াও অনেকে এলেন। ওদের সভাপতি বললেন, "আমরা চাই কাল পাকিস্তান জিতুক, কিন্তু প্রদীপ-ভাই ভাল খেলুক!" হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ দেখলাম না। সকলের ভালবাসায় অভিভূত হলাম। বিদায় নেবার আগে এল অমৃতি, ল্যাংচা, এবং ঢাকার বিখ্যাত মহারাজভোগ। আমি অমৃতি খেতে ভালবাসি, তাই খবরটা কী করে যেন আরজু পেয়ে গিয়েছিলেন। ঘিয়ে ভাজা দারুণ সব জিনিস। কিন্তু আজিজ কিছু না-খেতে বলে দিয়েছিলেন। নিখিল নন্দী ফিসফিস করে বললেন, "খাবি, যদি শরীর খারাপ হয়?" সত্যিই ভয় করছিল। আমাদের মনের কথা বুঝে আরজু বললেন, "প্রদীপ-ভাই তুমি খেতে ভালবাসো

বলে অর্ডার দিয়ে ঘিয়ে-ভাজা অমৃতি আনিয়েছি। তোমাকে আমরা ভালবাসি। তবু এত ভাবছ কেন?" আরজুর কথা শুনে লজ্জা আর আবেগে চোখে জল এসে গেল। আর সময় নষ্ট না করে অমৃতি, ল্যাংচা আর মহারাজভোগের সদ্ব্যবহার করলাম। হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ম্যানেজার সরোজ বসু আমাদের ঘরে এলেন। কিছু জানতেই পারলেন না।

ফাইনালে টীমে ফিরে এলেন সনৎ শেঠ। এই দিন থঙ্গরাজ বললেন, "সনৎদাকেই খেলাতে হবে।" এইরকম ব্যাপার আজকাল ভাবা যায়? সনৎ শেঠ ছাড়া টীমের বাকি দশজন: আজিজ, লতিফ কেম্পিয়া চন্দন সিং নিখিল নন্দী, পি কে ব্যানার্জি, সাত্তার, নেভিল ডিসুজা, কিট্টু এবং পূরণ বাহাদুর। এই টীমের দুজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় সনৎ শেঠ এবং পূরণ বাহাদুরের দুর্ভাগ্য, কখনও অলিম্পিকে যাননি। কেন? আমি মনে করি না 'দুর্ভাগ্য' শব্দটি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বড় হলে বুঝবে, এমন অনেক কিছুই ঘটানো হয়, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। সনৎ শেঠের মতো 'গ্রিপিং' আন্তর্জাতিক ফুটবলেও দুর্লভ। উনিশশো ছাপ্পান্নর মেলবোর্ন অলিম্পিকের ভারতীয় দল থেকে সনৎ শেঠ বাদ পড়ায়, অন্যতম নির্বাচিত গোলকীপার থঙ্গরাজ মন্তব্য করেছিলেন, "অবাক কান্ড, ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান গোলকীপারই বাদ!"

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলের শেষ ম্যাচের দিন সকাল থেকেই ভারতের শিবিরে সাজো সাজো রব। দেশের মাঠে খেলছে পাকিস্তান, তার ওপর বারবার রোলার চালিয়ে ওদের সুবিধামতো মাঠ শক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

খেলা শুরুর ঘন্টাখানেক আগে মাঠে পেঁছে ড্রেসিং রুমে ঢুকে একটা নতুন জিনিস অনুভব করলাম। এমন অনুভূতি আগে হয়নি। হাতে ঘাম, কান গরম। পরে জেনেছি, একেই বলে 'ওয়ার ফীভার'। এবং এরপর থেকে ওই 'যুদ্ধ-জ্বর' বেশ উপভোগই করতাম!

সাত্তার, পূরণ বাহাদুর, আজিজ, চন্দন সিংয়ের মতো সিনিয়র খেলোয়াড়দেরও

থঙ্গরাজ

যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হল। ভারতের পতাকা নিয়ে অধিনায়ক আজিজ বললেন, "এই পতাকা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, শরীরে যতক্ষণ রক্ত বইছে, প্রাণ যায় যাক, আজ হেরে ফিরবে না!" সবশেষে উঠলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পঙ্কজ গুপ্ত—যিনি ঢাকায় 'কুইট্টা' (কুট্টি) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আজ আমি প্রবাসী, কিন্তু এটাও আমার দেশ। এই ঢাকাতে আমার জন্ম। বোম্বাইয়ে ক্রিকেট বোর্ডের জরুরি মীটিং ছেড়ে আমি এখানে এসেছি ভারতের জয় দেখতে। ঢাকার মাটিতে তোমাদের হারা চলবে না। ভাল খেলতে হবে। ভাল খেললে জিততে হবে।"

মাঠে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। মাঠে অত লোকের বসার জায়গা না থাকলেও প্রায় আশি হাজার লোক ঢুকে পড়েছেন। খেলোয়াড়দের মাঠে ঢোকার পথটুকুও বন্ধ! কোনোরকমে ঢোকার চেষ্টা করলাম। একজন দর্শকের জুতোর চাপে সাত্তারদার পা ফেটে রক্ত বেরোল। তিনি খালি পায়েই খেলতেন। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু মানুষ আর মানুষ। ওই জনসমুদ্রের মধ্যে থেকেই এক অসমসাহসী দর্শক চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফাইট ইন্ডিয়া ফাইট।" (ক্রমশ)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

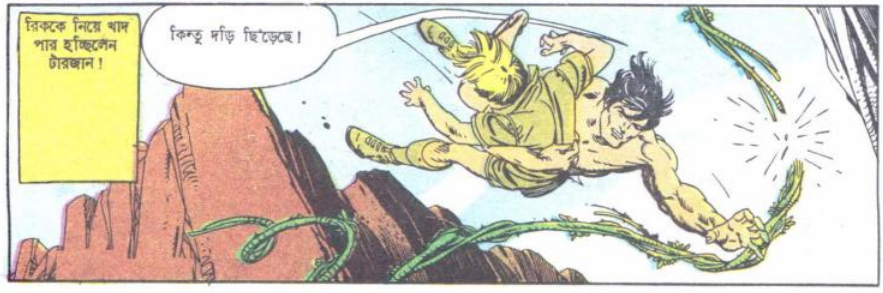

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
স্বাদু কেক
কেক ও প্যাস্ট্রি
পাক প্রণালী
আসল পাথুরে কেক
শস্তায় বিক্রি হবে

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

কুম্ভক

জানিস তো, রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলতেন, 'আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে?'

হ্যাঁ, পড়েছি 'ছেলেবেলা' বইতে। কী মানে হল ওই কথাটার?

নন্তু বলল ঃ নামের যে কোনো মানে হয় না, লজিকের এই কথাটা জানতেন না বুঝি রবীন্দ্রনাথ?

নামের কোনো মানে হবে না কেন? রবি কথাটার মানে তো একটা আছেই। বলতে পারিস, নামের সঙ্গে সেই লোকটার চরিত্রের কোনো মিল নাও থাকতে পারে।

আমার এক গম্ভীর বন্ধু আছে, প্রায় রামগরুড়ের ছানা, তার নাম সুহাস।

সেই তো কথা। নামের সঙ্গে মেলে না মানুষ। কিন্তু কেউ যদি তার নামটাকে নিজের জীবনের প্রতীক বলে ভাবতে চায়? নিজেকে যদি গড়ে তুলতে চায় সেইভাবে?

মানে, তুমি বলছ, সুহাস যদি হাসতে চায়?

ধরু তাই। বা, শুধু নামই বা কেন। বাইরের প্রকৃতির যে কোনো একটা টুকরোকেও তো কেউ ভেবে নিতে পারে নিজের জীবনের প্রতীক। পারে না ভাবতে?

টুম্পি জিজ্ঞেস করল ঃ কেমন করে?

ওই-যে সেদিন ইস্কুলে আবৃত্তি করাল

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,' কী ছিল সে কবিতায় মনে পড়ে?

নিজের নামের কথা ছিল?

না, নামের কথাই নয়। সূর্যেরই কথা ঝরনার কথা পাহাড়ের কথা পৃথিবী কথা। গুহার মধ্যে পাথরের মধ্যে যেন বন্দ ছিল জল, বাইরের জগৎকে জানত না সে, আজ হঠাৎ 'থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে/ফুলিয় ফুলিয়া ফেনিল সলিল/গরজি উঠি দারুণ রোষে।'

ঝরনা যেন নেমে আসছে এবার সমত পৃথিবীতে। নদী হয়ে বয়ে যাবে মাটি বুকের ওপর। একলা থাকার দশা এবা ভেঙে গেল তার, স্বপ্নভঙ্গ হল। মহা-সাগরের আহ্বান শুনছে সে, 'সারাপ্রাণ ঢা দিয়া/জুড়ায়ে জগৎ হিয়া/আমার প্রাণে মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।' এবার ব তো, কী নিয়ে এই কবিতা?

কেন, ঝরনা নিয়ে।

ঠিক। ঝরনা নিয়ে। কিন্তু কেবলই ঝরনা নিয়ে নয়, কবি নিজেকে নিয়েই লিখছেন এটা। এই যে 'গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখির গান' এসে পৌঁছল আর জগতের দিকে ছুটে যেতে চাইল নির্ঝর, এর মধ্যে কবি তো তাঁর নিজেরই একলা থাকার দুঃখ থেকে মুক্তি চাইছেন? প্রকৃতির বর্ণনার চেয়েও একটু বেশি কথা এল না এই কবিতায়?

নন্তু বলল ঃ একদিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই কবিতা, না? 'জীবনস্মৃতি'তে পড়েছি সেই সকালটার কথা।

কেবল 'জীবনস্মৃতি' নয় রে, সেই সকালের কথা অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন উনি। ও'দের সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দা থেকে সূর্যোদয় দেখছিলেন একদিন দেখতে দেখতে হঠাৎ কেটে গিয়েছিল তাঁর মনের সব ভার। সূর্যোদয় তো অনেকেই দেখি। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথ সূর্যোদয়ের ঘটনাটিকেই দেখেননি শুধু, দেখেছিলেন তার মানেটাকে। তাঁর মনে হয়েছিল, ওই সূর্যের মতো আমরাও, আমরা সকলেই নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পারি সমস্ত জগতের দিকে। খুব ভাল হয় না তাহলে? ছড়িয়ে দিলে? (ক্রমশ)

া-বাবার দিন

প্রসাদ

কী ব্যাপার, আজ চামেলিদের ইস্কুলে রকম বাস্ত-সমস্ত ভাব কেন? উঁচু ক্লাসের য়েরা তো এমন ভাবে ঘোরাঘুরি করছে ার হুকুম-টুকুম চালাচ্ছে যেন তারাই স্কুলের দিদিমণি। নিচু ক্লাসের মেয়েরা তার মধ্যে আমাদের চামেলি দেবীও আছেন) হা আনন্দে তাদের হুকুম তামিল করছে। াজের নামে বাড়িতে যাদের গায়ে জ্বর াসে, সেইসব মেয়েরও আজ উৎসাহ দেখে ! কিন্তু, ব্যাপারখানা কী?

It's a very important day at hameli's school.

Everybody is very busy.

All the girls are preparing for the nnual Parents' Day celebration.

All the teachers are helping them.

A corps of volunteers has been aised.

Each volunteer has a special job to lo.

Every volunteer knows she must do er job well.

Chameli is a volunteer.

She is very proud of it.

Each one of the volunteers has been iven a badge to wear on her lapel

নানারকম কাজকর্ম চলছে।

One of the girls has climbed on a adder

She is putting up a sign over the ront door.

It has WELCOME painted on it.

One of the girls is holding the adder.

Some of the girls are working inide.

One of them has been put in charge f decoration.

They are decorating the school auditorium.

Others are planning entertainment.

One of them is putting some girls hrough the final rehearsal of a short

skit.

A skit is a light, amusing play.

The skit is one of the many items on today's programme.

Many small boxes of light refreshment have arrived.

The boxes are stacked on tables.

Each of the guests will be given a box.

Every girl is eagerly looking forward to the arrival of her parents.

They will start arriving before long.

একটুপরেই বাবা-মা'রা আসতে আরম্ভ করবেন। ততক্ষণ আমরা লক্ষ করি ঃ

All the teachers *are* helping them.

Each volunteer *has* a special job.

One of the girls *is* holding the ladder.

Every volunteer *knows* she must do her job.

এবারে তোমরা নীচের ফাঁকগুলো ভরাট করো ঃ

Many of the guests—arrived. (*has/have*)

Some of them—always late.(*is/are*)

One of the teachers—to receive the guests at the gate.(*is/are*)

Every one of the girls—proud and happy. (*feel/feels*)

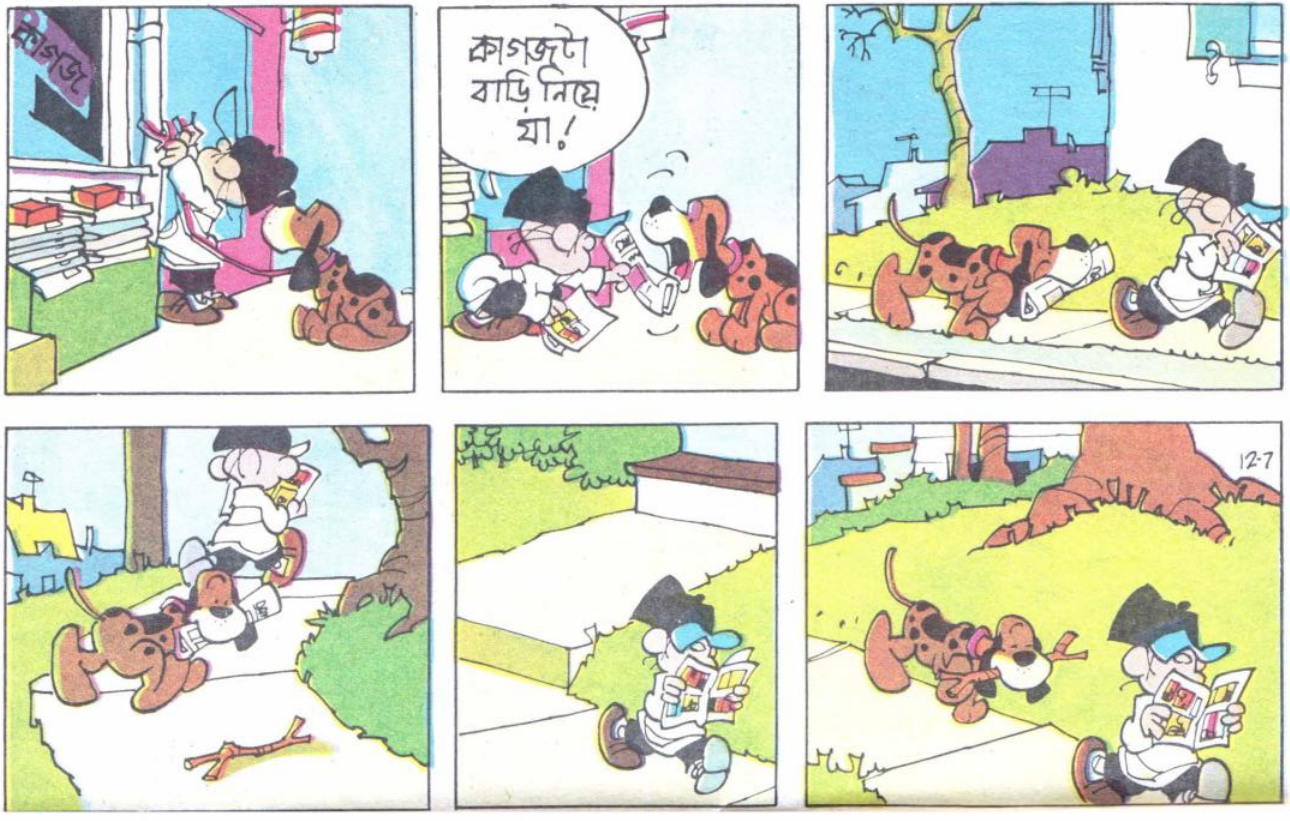
কাগজ
কাগজটা বাড়ি নিয়ে যা!
12-7

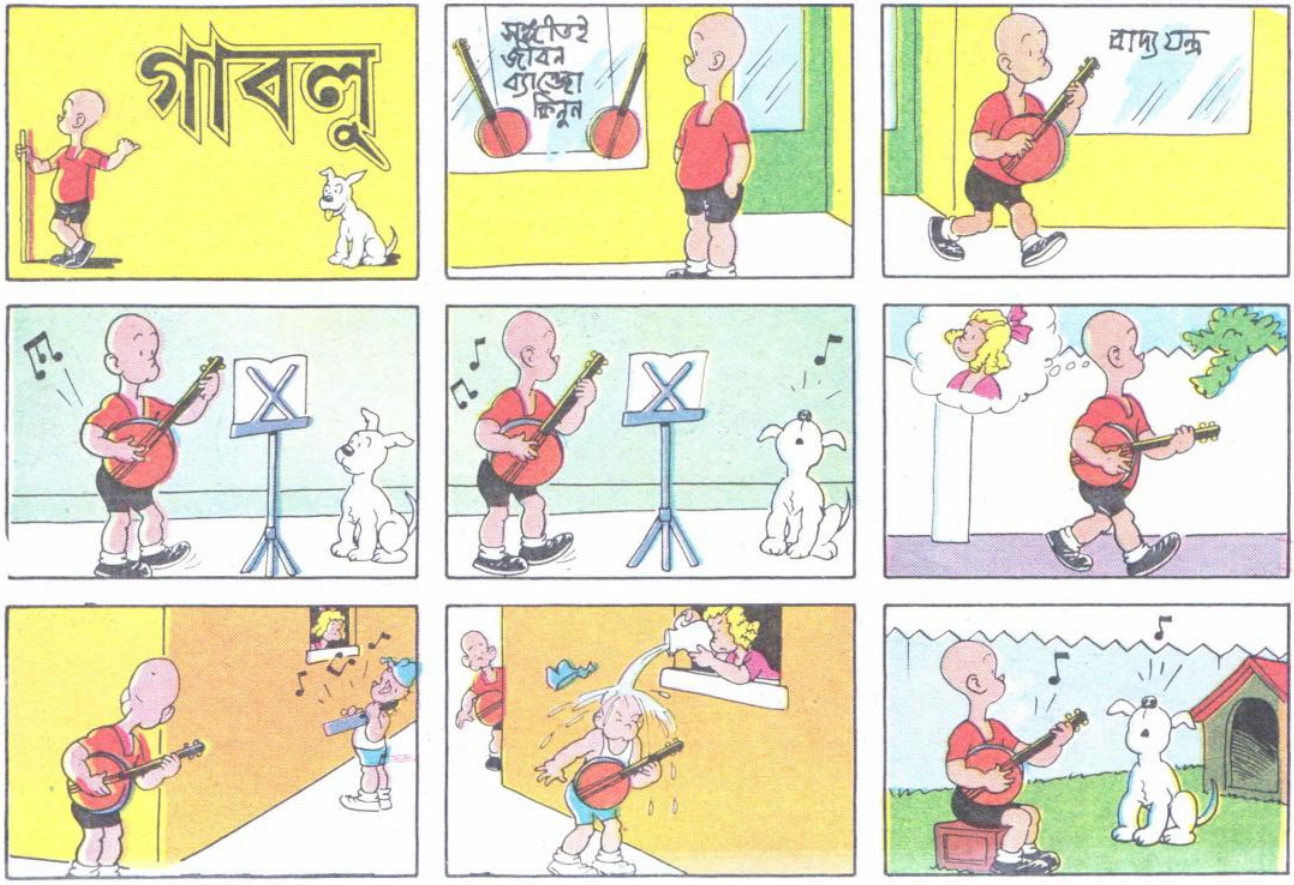
গাবলু
সঙ্গীতই জীবন ব্যান্ডো কিনুন
বাদ্য যন্ত্র

ওড়া পাখি

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবল কয়েকটা রেখায় প্রথম ধাপে ধরা হল ওড়া পাখির বিশেষ সরল গতিকে। দ্যাখো, কেমন মিল আছে উড়ে-যাওয়া উড়ো-জাহাজের সঙ্গে। আসছে-বার দেখবে এই পাখিই অল্প রেখার যোগে কত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে!

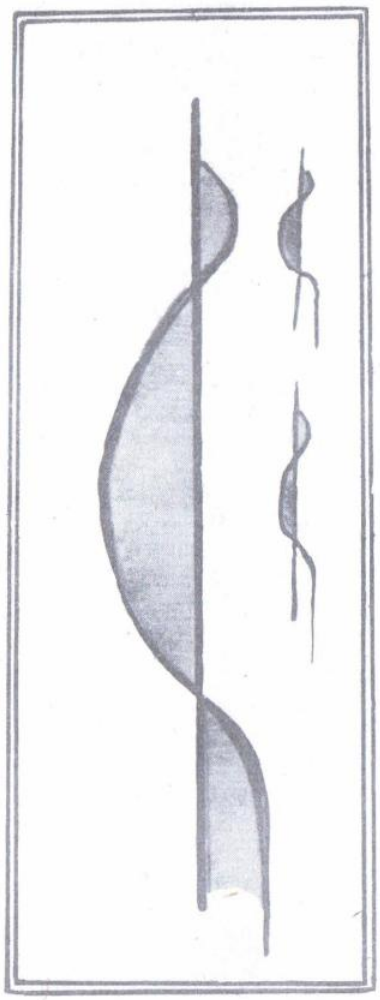

কাগজের ঝোলনা—১

কারিগর

এ-কাজের জন্য দরকার নানান রঙের কাগজ, সুতো আর কাঁচি-আঠা তো বটেই।

বড় কাগজকে নিজের কাজের মাপমতো চৌকো করে কেটে নাও (ক-ছবি)। এই চৌকো কাগজ অন্তত ৮—১০টি টুকরো একসঙ্গে করে ক্লিপ করে বেঁধে নাও (খ-ছবি), যাতে নড়ে না যায়। ক্লিপ করার পর কম্পাস দিয়ে ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি গোল দাগ কেটে নাও ক্লিপ-করা কাগজের ওপর।

ক্লিপ-করা কাগজগুলোর ওপরটিতে দাগ দিলেই চলবে। পরের কাজের জন্য আসছে-বার লক্ষ রাখো।

জেনে রাখো—(১) এই ঝোলনার জন্য দরকার বাহারি নানান রঙের কাগজ—তাতে দেখতে সুন্দর হয়। অবশ্য একরঙা ঝোলনা দেখতে খারাপ হয় না, সেটা নির্ভর করে কী-রকম পরিবেশে তুমি ঝোলাবে তার ওপর। (২) কাগজের সাইজ যেমন ইচ্ছে বড় করতে পারো, কিন্তু কখনোই ৬ ইঞ্চির কম গোল না হয় (৩) নিখুঁত মাপমতো কাটার ওপর এর বাহার নির্ভর করে।

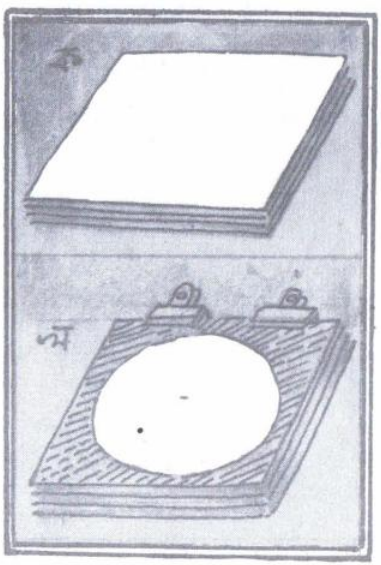

শতাধিক বছর ধরে বিচক্ষণ
মায়েরা নির্ভর করে আসছেন।

উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট

ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN